পার্ল. এস. বাক্ (East Wind : West Wind)

দুই ধারা

অনুবাদক

অশোক গুহ

পূরবী পাবলিশার্স
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বোন,

তোমার কাছে যেমন করে মনের কথা খুলে বলতে পারি, এমন করে তো আর কারো কাছে পারি না—আমার নিজের দেশের মেয়ের কাছেও না। ওরা কি করে বুঝবে আমার দুঃখ, আমার ব্যথা? আমার স্বামী পাকা সাহেব! বারো বছর তোমাদের দেশে কাটিয়ে ওঁর চাল-চলন একেবারে বদলে গেছে! ওদের কাছে তাঁর কথা বলতে গেলে অবাক হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকবে, হয়তো গালাগালও দিয়ে বসবে—না, সে আমি সহ্য করতে পারবো না! তাইতো বোন, তোমার কাছে ছুটে আসি আমার সুখ-দুঃখের গল্প করতে। তুমি- ই বুঝবে আমার স্বামীকে, আমাকে, আমার জাতিকে। এদেশেও তো তোমার কম দিন হলো না—কত? বারো বছর! তা হলে বলি বোন, হাঁ, তুমি বুঝবে, তুমিই বুঝবে আমার দুঃখ।

আজ পাঁচশ বছর ধরে আমার পূজনীয় পূর্বপুরুষরা মধ্য-এসিয়ার এই পুরোনো সহরে আছেন। এই সহরের ওপরে তাঁদের মায়া পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই! তা না হলে পাঁচশ বছরে একটিবার বদলাবারও নাম করেন নি! তাঁরা এইখানেই সুখে স্বচ্ছন্দে, তাঁদের জীবন কাটিয়ে গেছেন। বাবাও পূর্ণমাত্রায় তাঁদের স্বভাব পেয়েছিলেন। তিনিও পূর্বপুরুষের রক্ষণশীলতাকে বজায় রেখে নিরুদ্বেগে নিজের জীবন কাটিয়ে গেছেন। আমারও গর্ব, এই রক্ষণশীলতার আবহাওয়ায় আমার জীবনও গড়ে উঠেছে—এই জীবনকে আমি সত্য ও সুন্দর বলে মেনে নিয়েছি। ছেলেবেলায় যখন শুনতাম, আধুনিক মেয়েরা রক্ষণশীলতার বাঁধ ভেঙে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে, লজ্জায় শিউরে উঠতাম। ছিঃ, একি বেহায়াপণা! আমাদের বাড়ীর পাঁচিল ডিঙিয়ে আধুনিকতার এই বিষাক্ত হাওয়া কোন দিনই ঢুকতে পারে নি। বাবা ও মা তাঁদের যুগার্জিত সংস্কারের বলে তাকে বাধা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমিও তাঁদের মেয়ে তো, আধুনিক হাওয়া তাই আমাকেও ছুঁতে পারে নি। এখন কিন্তু বোন, অনেক বদলে গেছি, নতুন হাওয়াকে আগের চোখে আর বিচার করতে সাহস হয় না। আমার স্বামী যে আবার ঐ দলেরই একজন!

আমি সুন্দর নই। অন্ততঃ উনি তো কোনোদিন বলেন নি। আর ওঁর কি সুন্দর-অসুন্দর বিচার করবার মত

চোখ আছে? চার-সাগর-পারের আধুনিকতার ছানি ওঁর চোখে!

বোন, মা আমার খুব বুদ্ধিমতী! যখন আমার বয়স সবে দশ বছর, মা আমাকে একদিন ডেকে বললেন ঃ

"মা, শোন, তুমি বড়ো হয়েছ, জীবনের পথে চলার সময় এগিয়ে এলো। সর্বদা এই কথাটি মনে রেখো ঃ মেয়েরা পুরুষের কাছে ফুলের মত নম্র হয়ে থাকবে, বুক ফাটবে তো, মুখ ফুটবে না,—এ কথাটি কোনদিন ভুলো না।"

প্রথম প্রথম যখন স্বামীর কাছে যেতাম, মার উপদেশ কানে বাজতো। মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, উনি কথা বললে উত্তর দিতাম না। কি জানি. বোবাই ঠাওরাতেন নাকি!

এমন কিছু আমার ছিল না যা দিয়ে ওঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি। ছুঁচের কাজ করতে-করতে বিয়ের আগে তো অনেক মিষ্টি কথা মনে পড়তো। নির্জন ঘরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কতদিন তো কত কথা বলেছি। না, বোন, পশ্চিমী মেয়েদের অমন নীরস কাটখোট্টার মত কথা নয়! বলেছি ঃ

"স্বামি, ভোরের সৌন্দর্য আজ দেখেছিলেন? নির্জীব, ঘুমন্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ আলোর কামনায় জেগে উঠলো। আঁধার, ঘন আঁধারের বুকে এলো প্রথম আলোর স্পর্শ। স্বামি, দেবতা, আমি সেই নির্জীব আঁধার-ভরা পৃথিবী, তোমার স্পর্শের কামনায় ব্যাকুল।"

সূর্য ডুবতো। পদ্ম-হ্রদের জলে দিনশেষের পাণ্ডুতা ছেয়ে যেতো। কতদিন কাঁদতে-কাঁদতে বেদনা-পাণ্ডুর পৃথিবীর দিকে চেয়ে বলেছি ঃ

"সূর্য ডুবলো। ঐ শীর্ণ জল রেখা—ওর জীবন কি ব্যাথায়ই না ভরে গেল! ও জানে না জ্যোৎস্না ওকে আনন্দ দেবে কি·না, জানে না চাঁদের কোমল স্পর্শের ইতিহাস। ও মরবে সূর্যের বিরহে। স্বামি, তুমি এস, তোমার স্পর্শের আগে আমার মৃত্যু না হয়!"

যখন বিয়ে হলো, ও কথা তাঁকে বলতে পারলেম কই? দেখলাম, খাঁটি সাহেব! দূর, ও সব কথা সাহেবকে বলা যায় নাকি! আমার এত ঘটা করে পাঁচ-রঙা সাটীনের পোষাক পরা, চুলে মুক্তো গোঁজা—সব বিফলে গেল। তিনি ফিরেও তাকালেন না! বিদেশী—আমার স্বামী বিদেশী! আমাকে হয়তো বা কুশ্রী বলেই মনে করলেন।

বোন,

ক'দিন বসে তো ভাবলাম, কি করে স্বামীকে আমার সুখী করবো, তাঁর মনের মত হব। কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। মনে ধিক্কার এলো,—আমি কি তাদের কেউ নই, যারা ছলাকলায় স্বামীকে ভুলিয়ে রাখে? কিন্তু হায় তারাও

আমার মত বিশ্রী দেখতে নয়! তক্ষুনি মনে পড়লো কিউই-মীর কথা। হাঁ, সে তো বিশ্রী দেখতেই ছিল।—সমস্ত মুখ বসন্তের দাগে ভরা! তবু তার ছিল গো, রূপ ছিল! উজ্জ্বল কালো ছু'টি চোখের তারা আর কণ্ঠস্বর তাকে সুন্দর করে তুলেছিল। কি স্বামী-সোহাগিনীই ছিল সে! ছ-ছটি উপপত্নী থাকলেও স্বামী তাকেই ভালবাসতেন। অতদূরই বা যেতে হবে কেন? আমারই বংশের মেয়ে ইয়াং-কিউই-কী—যে তার হাতের ওপর বসিয়ে রাখতো একটি ছুধের মত সাদা পাখী। সে সমস্ত চীন সাম্রাজ্যখানা হাতের মুঠোয় পূরে রেখেছিল। এমন যে চীন সম্রাট, ভগবানের যিনি সন্তান, তিনিও তাঁর রূপে আত্মহারা হয়েছিলেন। জানি তো বোন, এদের পায়ের নখেরও যোগ্য আমি নই, তবু তো আমি এদের বংশেরই মেয়ে, এদের রক্ত আমারই রক্ত, এদের অস্থি আমারই অস্থি!

আমার ব্রোঞ্জ-ফ্রেমে বাঁধান আরসীতে মুখখানা ভাল করে দেখলাম, না, না, নিজের জন্য নয়, ওঁর জন্যই দেখতে হলো। কেন, এমন কি খারাপ দেখতে আমি? কত মেয়ে তো আছে আমার চাইতে কুশ্রী! আমার চোখ ছু'টি তো বেশ—সাদার ভেতর কালো মনি ছু'টি জ্বলছে; কান ছু'টিও বেশ ছোটো, ছুল পরলে মানাবে যা চমৎকার! ডিমের মত মুখের সঙ্গে ঠোঁট ছু'টি তো দিব্যি পাতলা, নরম আর লাল! কিন্তু কেমন যেন ম্লান—সতেজ ভাব নেই একটুও। আর ভ্রূ ছু'টি,

আর একটু টেনে দিলেই বা কার কি ক্ষতি হত? যাক্ খোদার ওপর খোদকারী করতে তো আর কসুর নেই। একটু গোলাপী রঙ্ গালে আর ভ্রূতে কালো রঙ্ দিয়ে খুঁতটুকু শুধরে নিলাম।

সেজে গুজে রোজ বসে থাকাই সার হত। তিনি এসে তো আমার পানে তাকাতেনও না। তাঁর মন রয়েছে চার সাগরের পারে, হয়তো বা সমস্ত পৃথিবীতে—কিন্তু আমার কাছে নয়, আমার কাছে নয়!

দৈবজ্ঞ যেদিন এসে বিয়ের দিন ঠিক করলেন, সে দিনের কথা আজও মনে পড়ে।

চারদিকে ধূমধাম। বড় বড় লাল বার্নিশ-করা বাক্স এলো বিয়ের বাজার ভর্তি হয়ে, সাটীনের লেপ-তোষকের স্তূপ হয়ে গেল টেবিলের ওপরে; আর বিয়ের পিঠেয় একটা গোল প্যাগোডা তৈরী হলো! বাড়ীতে কি আনন্দ!

এমনি একদিনে মা আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন! হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে. চুল আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলাম, তিনি তখন তাঁর প্রিয় আবলুস কাঠের চেয়ারটিতে বসে চা খাচ্ছিলেন। রূপো দিয়ে বাঁধানো বাঁশের নলটি দেয়ালের এক কোনে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে।

আমি মাথা নুয়ে, তাঁর চোখের দিকে না চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, তাঁর চোখের তীক্ষ্ণ স্পর্শ যেন আমার মুখে, চোখে, সারাদেহে এসে লাগছে, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করছে! তিনি আমাকে বসতে বলে পাশের রেকাব থেকে কতগুলো তরমুজের বীচি নিয়ে খেলা করতে লাগলেন; কিছুক্ষণ পরে বল্‌লেন:

"মা, কিউই-লান, যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তোমার জন্মের আগে থেকেই তুমি তাঁর বাগদত্তা। তাঁর বাবা আর তোমার বাবা পরম বন্ধু। এই বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁরা তোমাদের বিবাহের সম্বন্ধ করে রেখেছিলেন। তোমার স্বামীর ছ'বছর বয়স, তখন তুমি জন্মালে, ভগবানের ইঙ্গিতে তাঁদের প্রতিজ্ঞা রক্ষারও উপায় হলো।

"এই সতেরো বছর ধরে এই সুদিনটির কথাই শুধু আমি ভেবেছি, তোমাকে যা কিছু শিখিয়েছি, মনে রয়েছে তোমার স্বামীর কথা, তোমার শ্বাশুড়ীর কথা। সব দিক দিয়ে তাঁদের উপযুক্ত করে যেন তোমাকে গড়ে তুলতে পারি—এই ছিল আমার একমাত্র চেষ্টা। গুরুজনের সমুখে কেমন করে দাঁড়াতে হয়, তাঁদের নিন্দা বা প্রশংসা কেমন চুপ করে শুনে যেতে হয়, কেমন করে তাঁদের চা দিতে হয়—সবই আমি তোমায় শিখিয়েছি।

"হাঁ তারপর, স্বামীর কথা। স্বামীর ভালবাসা পেতে হলে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, তিনি যখন কাছে

ডাকবেন, দিব্যি সেজে গুজে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। কথা বলো না, যা জানাবার চোখমুখের হাবভাবে জানিও।—এ-কথা-গুলো যে কত দামী মা, স্বামীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পরই তা বুঝতে পারবে। একজন ভদ্রমহিলার কর্তব্য কি, বোধ হয়, তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। গুরুজনদের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা, চাকর-চাকরানীদের সঙ্গে কথা বলা, গাড়ীচড়া—এই সবের ভেতর দিয়েই তো বড় বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। বেশি আর কি বলবো, পোষাকে আচারে ব্যবহারে বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখবে এই আমার আশীর্ব্বাদ। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে আশা করি তুমি তাঁদের ক্ষুণ্ণ করবে না। তোমার ঐ ছোট্ট পা দু-খানি! কত চোখের জলই না ফেলেছ, কিন্তু কি চমৎকারই না হয়েছে! কই অমন পা তো আজকালকার মেয়েদের কারো দেখলাম না! আমার পাও তোমার মত বয়েসে এর চেয়ে সামান্যই ছোটো ছিল। তোমার দাদা তো লী-দের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছে। কি জানি, আমার কথামত তারা পা বাঁধতে সুরু করলো কিনা! বিশ্রী পা নিয়ে তো আর আমার ঘরের বৌ হওয়া চলবে না! আবার শুনেছি, সে নাকি মস্ত বিদ্বান; কৈ বিদ্যা আর রূপ তো এক জায়গায় দেখলাম না। না, আবার ঘটক পাঠাতে হবে দেখছি!

"আমার ছেলের বৌটি যেন তোমার মতই হয়, মা। তোমাকে তো আমি ঘর-গৃহস্থালী থেকে সুরু করে

লেখাপড়া, ছুঁচের কাজ, বাজনা—সবই শিখিয়েছি। তোমার স্বামীর আনন্দের জন্য তুমি পুরোনো কবিদের লেখা গান গাইবে বীণা বাজিয়ে, তোমার সুন্দর আঙুল যখন বীণার তারের ওপর খেলা করবে, স্বামী নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন। না, খুঁত তারা ধরতে পারবে না আমার শিক্ষার, তবে যদি নিজের ভাগ্য মন্দ হয়, যদি সন্তান না হয়। আমি মন্দিরে গিয়ে পূজো দেব, তবে প্রথম বছর না হওয়াই ভালো!"

লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম। যদিও আমাদের পরিবারে জ্ঞান হয়েই সবাই পেকে ওঠে। বাবার উপপত্নীরা বছরে একটি করে সন্তান প্রসব করে জন্ম-রহস্যকে অতি সাধারণ করে ফেলেছে। কিন্তু ওকথা—যাঃ, মা যেন কী?

মা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

"একটা কথা", তিনি শেষের দিকে বললেন, "তোমার স্বামী ডাক্তারী পড়তে না বিদেশে গিয়েছিল? কে জানে, কেমন হয়! যাক্ তুমি এবার যাও।"

জানি না, এত কথা মা'র মুখে আর কেউ কখনো শুনেছে কিনা! তিনি বড়ো কম কথা বলেন; দু-একটা হুকুমের হাঁক-ডাক ছাড়া এত কথা বোধ হয় জীবনে এই প্রথম বললেন। তা গৃহকর্ত্রীকে একটু সংযত হতে হবে বৈকি! ছ্যাবলা হলে কি আর চলে!—আচ্ছা বোন, মাকে দেখেছ তো? ফোটো? ফোটোতে কি আর আসল মানুষটিকে পাওয়া যায়! কি রঙ্ মার! এই বুড়ো বয়সেও রঙ্ যেন একটুও ম্লান হয়নি। শুনেছি, যৌবনে নামী সুন্দরী বলেই পরিচিত ছিলেন। এখন বয়স হলেও তাঁর মুখ শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের ছবিগুলিকে মনে করিয়ে দেয়। সেবার এক মহাসম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্রমহিলা ওঁর চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন: 'যেন দু'টি কালো মুক্তা পৃথিবীর দুঃখের ছোঁয়াচে কেমন যেন বিবর্ণ, ম্লান!'

দুঃখিনী মা!

মার মত এমন শান্ত, সংযত এমন আত্মমর্য্যাদাসম্পন্না কাউকে দেখলাম না বোন! ছোটবেলায় দেখেছি, মার দাপটে বাবার উপপত্নী ও তাদের ছেলে-মেয়েরা ভয়ে টুঁ শব্দটি করতে পারতো না। চাকর-চাকরাণীরা মার আড়ালে গজগজ করতো।

তাই বলে বাবার উপপত্নীদের মত সামান্য ব্যাপারে গালি-গালাজ বা চীৎকার করতে আমি তাঁকে দেখি নি। তাঁর সঙ্গে মতে না মিললে তিনি গম্ভীরভাবে দু-একটা কথা বলতেন বা চুপ করে থাকতেন। ওই দু-একটা কথায়ই কাজ হত।

মাঝে মাঝে তিনি আমাকে আর দাদাকে আদর করতেন, কিন্তু সে আদর এমন কিছু নয়—একটু মাথায় হাত দেয়া, দু'টো মিষ্টি কথা বলা শুধু। কি জানি, গৃহকর্ত্রীকে বোধ হয় ওর বেশি করতে নেই! ছ'টি সন্তানের ভেতর আমরা দু'টিই দেবতাদের দয়ায় বেঁচে আছি বলেই এই আদরটুকু পেতাম। দাদা ছেলে বলে তার ভাগ্যে আদর বেশি জুটতো। বাঃ জুটবে না, ছেলে যে! স্বামী আর স্বামীর বংশের প্রতি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তো মা দাদাকে উপহার দিয়েই পালন করলেন। দাদার ছেলেবেলায় যা সুন্দর চেহারা ছিল!—মা বোধ হয় ওর জন্যে একটু গর্বও অনুভব করতেন।

দাদাকে দেখেছ বোন? মার মতই পাতলা গড়ন, তেমনি লম্বা। ছেলেবেলা আমরা এক সঙ্গে কত খেলেছি। ও-ই তো আমাকে অক্ষর পরিচয় করালো। ন'বছর বয়সে অন্দর ছেড়ে সেই যে সদরে চলে গেল, তারপর দেখা হত কালে-ভদ্রে! দেখা হলেও আগের সে-ভাব আর ছিল না। আমি মেয়ে বলেই ও আর মিশতে চাইতো না। মাও কখন ওকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি।

সদর ছিল আমার গণ্ডীর বাইরে। বেশ মনে পড়ে, দাদা

তখন আর অন্দরে আসে না। একদিন সন্ধ্যার আঁধারে পা টিপে টিপে সদরের সেই চাঁদের মত গোল দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কি ভয়ই করছিল!···চারদিকে চাকররা খাবারের থালা নিয়ে ছুটোছুটি করছিল, আর বাবার ঘর থেকে ভেসে আসছিল মেয়েলি গলার গান।

দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, দেখি, দাদাকে যদি পাওয়া যায়! দাদাটা যেন কি, আমাকে একেবারে ভুলে গেছে! কান্না পাচ্ছিলো। এমন সময় কার হাতের ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠলাম! ওমা দেখি, আমাদের বুড়ী ঝি ওয়াঙ্-ডা-মা দাঁড়িয়ে আছে!

"ফের যদি এখানে দেখি", আমাকে সে শাসালো, "মাকে বলে দেব! এমন মেয়েও তো সাত জন্মে দেখি নি বাছা, সদরে এসে পুরুষের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে!"

লজ্জায় ভয়ে মরে গেলাম! বললাম, "দাদাকে খুঁজতে এসেছি। দাদা আর খেলতে আসে না।"

"না!" বুড়ী ধমকালো, "সে আর তোমার সঙ্গে খেলবে না। সে বড় হয়েছে।"

তারপর দাদাকে আর বেশি দেখি নি। শুনেছিলাম, পড়তে নাকি সে খুব ভালবাসে। তাই বাবাকে বলে-কয়ে রাজি করিয়ে পিকিঙে পড়তে গেছে। আমার বিয়ের সময়ে সে পিকিঙের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। প্রতি চিঠিতে লিখতো, সে আরো বেশি পড়তে চায় আমেরিকা গিয়ে। মা

বিদেশ যাওয়ার নাম শুনে চটে উঠতেন ; বাবারও তাতে মত ছিল না। তবে গোলমাল তিনি ভালোবাসেন না বলেই আমার মনে হত দাদাই জিতবে।

আমার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার আগে, ছুটিতে দাদা একবার বাড়ী এলো। দাদা বাড়ী এসেই সবাইকে ডেকে 'বিজ্ঞান' বলে কি-একখানা বইয়ের কথা শোনালো, মাও বাদ গেলেন না। বাবা শুনে কোনো কথা বললেন না। মা তো রীতিমত চটেই গেলেন। চীনা গৃহস্থের জীবনে পশ্চিমী বিদ্যের যে কোনো দাম নেই বরং অলক্ষুণে, একথা তিনি বার বার বললেন। আর একবার দাদা আর একটা কাণ্ড করে বসলো! একেবারে টিপ্‌টপ্‌ সাহেব সেজে বাড়ী এসে ঢুকলো! মার ঘরে ঢুকতেই মেঝেয় লাঠি ঠুকে তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন, "তোমার এতদূর হয়েছে! বাঁদর সেজে আমার সুমুখে আসতে লজ্জা করলো না!"

বেচারা দাদা! বাধ্য হয়ে তক্ষুনি বিদেশী পোষাক ছেড়ে ফেলতে হলো। দু-দিন খায়না-দায়না, কারো সঙ্গে কথা বলে না। শেষে বাবা পোষাক পরতে অনুমতি দিলেন। মার কথাই কিন্তু ঠিক। চীনে পোষাকে দাদাকে কেমন সুন্দর লাগতো, আর বিদেশী পোষাকে, কেমন পর পর লাগছিল।

এই দু-বারেই আমার সঙ্গে দাদা দু-একটা কথা বলতো। কি নিয়েই বা বলবে বল? আমি তো লেখা-পড়া জানা পণ্ডিত

নই! বিয়ের খুঁটি-নাটি শিখতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে, বই পড়বো কখন?

দাদার বিয়ের কথা কি আর জিজ্ঞেস করা যেত না? যেত, কিন্তু সেখানে বাধা দিত চীনদেশের রীতি, আমার বংশগত সংস্কার। চাকর-চাকরাণীরা কাণাঘুষো করতো,—তা থেকে একদিন শুনলাম, এ বিয়ে নাকি ওর পছন্দ নয়। মা তিন তিনবার বিয়ের জন্য তাগিদ দিয়েছেন,—কিন্তু ও নাকি বলেছে, পড়া শেষ না হলে বিয়ে করবে না। লী-দের মেয়ের সঙ্গে ওর বাগদান হয়ে গেছে। লী-রা খুব বড় বংশ! তিন পুরুষ আগে ওদের আর আমাদের পূর্বপুরুষরা এই প্রদেশ শাসন করতেন!

না, দাদা নিজে পছন্দ করে বাগ্‌দান করে নি! ওটা আমাদের রীতিও নয় বোন। ওয়াঙ-ডা-মা বলতো, মেয়েটি নাকি দাদার চেয়ে কিছু বড়ো হবে। ওকথা কেই বা জানে! বংশটি কিন্তু খুব বড়!

জানি না, দাদা কেন যে বিয়ে করতে রাজি হলো না। দাদার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে পরিবারে খুব অশান্তির সৃষ্টি হলো। বাবার প্রথমা উপপত্নী তো একদিন বেশ রসালো করেই বললো, "বিয়ে করতে রাজি হবে কেন? পিকিঙে কোন মেয়ের পাল্লায় পড়েছে দেখগে!"

আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় নি। দাদা বই ছাড়া কিছুই ভালবাসে না।

আমার জীবন, বোন, নিঃসঙ্গভাবে এমনিধারা অন্দরের গণ্ডীর ভেতর কাটতে লাগলো।

উপপত্নীদের ছেলেমেয়ে ছিল একপাল, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশবারও উপায় ছিল না। মা তাদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না, নিতান্ত গলগ্রহ বলেই মনে করতেন।

বাব্বা! উপপত্নীদের সঙ্গে মেশা! তারা রাতদিন একে অপরকে গালাগাল দিত আর চেষ্টা করতো কি করে বাবার আদর পাবে। বুদ্ধি কারও ঘটে এক ফোঁটা ছিল না। বাবা তাদের ঘরে এনেছিলেন সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, তাদের সৌন্দর্য ফুরিয়ে গেলে তিনি তাদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। তারা কিন্তু বুঝতে পারতো না। বাবা বাড়ী এলে, আগের মতই গয়না-গাঁটি আর ভাল পোষাকের এক একটা যেন জীবন্ত দোকান হয়ে উঠতো। কি বোকা! জানে মধুকর তাদের মধু কবে শুষে নিয়েছে! তবু বাবা ওপর অবিচার করেন নি। জুয়ায় জিতে এলে, দু-এ টাকা তাদের দিতেন। তাতেই মহা আনন্দ! কয়েকটা দিন খুব কেনা-কাটি, খাওয়া-দাওয়া চলতো, তারপর যে-কে সেই! চাকরদের কাছে আবার ধার করতে সুরু করতো। বাবার আদর হারিয়ে চাকরদের শ্রদ্ধাও তারা হারিয়েছিল।

প্রথমা উপপত্নীটি ছিলেন দিব্যি মোটা-সোটা—একটি মাংসপিণ্ড বিশেষ! তার দেখবার মত জিনিষ ছিল, ছোট্ট গোলগাল দু-খানি হাত, তারই কত গর্ব! রোজ নানারকম

সুগন্ধি তেল মেখে হাত ধুত, তেলোয় মাখতো গোলাপী আর নখে সিন্দুরে রং ; তারপর সুগন্ধ ম্যাগনোলিয়া তো আছেই !

মা প্রথমার এই উগ্র বিলাসিতা দেখে হাড়ে হাড়ে জ্বলতেন। মাঝে মাঝে তাকে কাপড় পরিষ্কার করতে বা কিছু বুনতে দিতেন। প্রথমা ভয়ে ভয়ে কাজগুলি করতো আর গোপনে বলে বেড়াতো, মা তার হিংসেয় মরে যাচ্ছেন, তাই তার সৌন্দর্য নষ্ট করবার এই চেষ্টা। আমি একদিন তার হাত ছুঁয়ে দেখেছিলাম, কেমন একটু গরম-গরম জ্বোরো ভাব।

বাবা অনেকদিন আগেই প্রথমাকে ত্যাগ করেছিলেন। সদরে লোকের সুমুখে অপদস্থ হবার ভয়ে বাড়ী এলেই তাকে টাকাকড়ি দিতেন ; দু-এক রাত তার ঘরেও কাটাতেন। তার গর্ভে বাবার দু'টি ছেলে হয়েছিল, সেও বোধহয় তাঁর আকর্ষণের আর এক কারণ।

ছেলেগুলোও তাদের মার মত মোটা-সোটা ছিল। সারাদিন খাই-খাই করে ঘুরে বেড়াতো। চাকরদের সঙ্গে এই নিয়ে নিত্যি তিরিশ দিনই ঝগড়া বাধতো। মা-ও এই লোভী দু'টোকে দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তিনি নিজে খেতেন, সামান্য ক'টি ভাত, এক টুক্‌রো নোনা মাছ, এক পেয়ালা চা—পেটুকরা তাঁর দু-চোখের বিষ হবে না ?

দ্বিতীয়া সম্বন্ধে যদি কিছু মনে পড়ে, সে তার মরণের ভয়। অতি পেটুক। গো-গ্রাসে গিলে গিলে যখন তার

অসুখ হত, তখন পুরুত ডেকে বলতো—এবার যদি সেরে ওঠে, ভগবান বুদ্ধকে খোঁপার মুক্তোর মালা দেবে। কিন্তু সেরে উঠলে আর মনে থাকতো না। খাবারের নীচে মানৎ চাপা পড়তো বোধ হয়।

তৃতীয়া কম কথা কইতো। সংসার সম্বন্ধেও তার কৌতূহল ছিল না। তার পাঁচটি সন্তান, তার ভেতরে চারটিই ছিল মেয়ে। তাই এই নির্লিপ্ততা বোধহয়। উঠোনের যে-কোণটিতে খুব রোদ, সেখানে বসে তিন বছরের হাবা ছেলেটাকে নিয়ে খেলা করতো, মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকাতো না!

চতুর্থকে আমি সব চেয়ে পছন্দ করতাম। ছোট মেয়েটি দিব্যি ফুটফুটে! শুনেছি, সু-চাউয়ে নর্ত্তকী ছিল। নাম লা-মে। বসন্তের নতুন পাতা-ভরা গাছে লা-মে ফুলের মতই সুন্দর! মুখে রঙ্ মাখতে সে ভালবাসতো না, শুধু শীর্ণ ভ্রূ'র ওপরে একটু কালো আর নীচের ঠোঁটে আলতোভাবে একটু লাল ছুঁইয়ে সে তার প্রসাধন সারতো। বাবার সে ছিল প্রিয় সঙ্গিনী। বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো বলে আমরা তাকে অনেকদিন দেখি নি।

গত বছর—আমার বিয়ের আগে—সন্তান প্রসবের জন্য সে বাড়ীতেই ছিল। তার একটি ছেলে হলো। কি চমৎকার! বাবা বাড়ী এলে খোকাটিকে নিয়ে গিয়ে তাঁর কোলে শুইয়ে দিল। মাতৃত্বের গর্বে তখন তার মুখখানি ঝলমল করছে!

সন্তান প্রসবের পর হাসি, গান, গল্পে বাড়ীখানা সে মাত করে রাখতো। অমন সুশ্রী মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। পোষাকের বাহারে সে শ্রী যেন আরো শতগুণ বেড়ে যেত। কালো মখমলের সারোঙ আর সবুজ জামা পরে, কানে মুক্তোর দুল দুলিয়ে যখন পিঠে বা মেঠাই পরিবেশন করতো, মনে হত যেন পরীর রাণী! সে খাওয়া-দাওয়া খুব কম করতো, তবে বিদেশী মদ খেতে তার জুড়ি মেলা ছিল ভার! অনেক-দিন দেখেছি, অবিশ্যি লুকিয়ে—বিদেশী সোনালী মদের বুদ্বুদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। মদ খেলে কথা, নাচ, গান আর হাসিতে সে যেন উপচে পড়তো। বাবা বুঝি তাই তাকে এত ভালবাসতেন!

বাবা যখন লা-মেকে নিয়ে আমোদে ডুবে থাকতেন, মা তখন একা ঘরে বসে পড়তেন, কণ্‌ফ্যুসি-র বাণী। আর আমি? দাদাকে খুঁজতে গিয়ে সে-দিন যে আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলাম, ইচ্ছে করতো আবার ছুটে গিয়ে তার কিছুটা উপভোগ করে আসি।

কি লজ্জা! একরাতে বাবার ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম। না-সেদিন আর দাদার খোঁজে নয়। কি জানি, কি ছিল সেদিনকার রাতে, সেদিনকার পদ্মের গন্ধে! কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল অন্দর মহলের গণ্ডীর বাইরে। দেখলাম,… সারি সারি আলোর মালা বাইরের উষ্ণ আঁধার আর স্তব্ধতাকে চঞ্চল করে তুলেছে। ঘরের ভেতর প্রকাণ্ড টেবিল, তার চার

পাশে অসংখ্য লোক ; তাদের পাশে পাশে উজ্জ্বল পোষাকে এক একটি মেয়ে—আঙুর লতার মতই তন্বী। বাবার পাশে লা-মে। মুখখানা হাসি হাসি! খুব আস্তে আস্তে কি যেন বললো। আর হাসি…হাসি! ঘরের দেয়াল চুইয়ে যেন হাসির ঝরণা ঝরতে লাগলো!

ধরা পড়লাম! তাও আবার মার কাছে! তিনি তো কোনোদিন উঠোনেও নামেন না। আজ কিনা সদরে এলেন! বরাত! সুড় সুড় করে অন্দরে ঢুকলাম। মা বাঁশের তৈরী পাখা দিয়ে হাতের ওপর মেরে বললেন! 'লক্ষ্মীছাড়ি, কি দেখতে গিয়েছিলি—বেশ্যার নাচ! লজ্জাও হয় না!'

অপমানে, লজ্জায় কেঁদে ফেললাম।

মা লা-মেকে ভাল না বাসুন, কিছু বলতেন না। অন্য উপপত্নীরা কিন্তু হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরতো। লা-মে মনে করেছিল, সন্তান প্রসবের পর আর আর বারের মত বাবা তাকে নিয়ে বেরোবেন। সন্তানের দিকে নজর দিয়ে লা-মে তার সৌন্দর্য নষ্ট করতে রাজি ছিল না। সন্তান পালনের জন্য একটি জোয়ান দেখে ঝি রাখা হলো, ছেলেটি তার কোলেই অষ্টপ্রহর থাকতো। উৎসবের দিনে মা নতুন পোষাক, নতুন জুতো পরিয়ে আদর করে কোলে নিত, কখনো বা চুমু খেত। কেঁদে উঠলে কিন্তু একদণ্ড রাখতো না, ঝির কোলে ফেলে দিয়ে পালাতো।

ছেলে হওয়ার পর বাবার কাছ থেকে তেমন আদর সে পেত না। অন্যান্য উপপত্নীদের মতই বাবার আদর পাবার জন্য নানা ছল করতো। তেমনি ঘটা করে পোষাক পরতো, তেমনি হাসতো। বাবা মুখে কিছু বলতেন না, কিন্তু লা-মের যৌবন নিঃশেষিত প্রায় একথা তিনি জানতেন। তাই সেবার বিদেশে যাওয়ার সময় লা-মেকে নেন নি।

লা-মে রাগে, দুঃখে, অপমানে ফুঁসে উঠলো ; সবচেয়ে খুশী হলো উপপত্নীরা। মা তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন। বুড়ি ঝি ওয়াঙ-ডা-মা কিন্তু গজ্ গজ্ করতে করতে বললো ঃ

'আর একটা পুষ্যি বাড়লো সংসারে।'

অসন্তোষ আর দুঃখ নিয়ে লা-মে তলিয়ে গেল অন্দর-মহলের একঘেয়ে জীবনযাত্রার মাঝে। কেউ তার কথা আর ভাবতো না। সে চুপচাপ বসে থাকতো। মাঝে মাঝে রাগে দুঃখে কি সব বলতো, কিন্তু কে-ইবা শোনে তার কথা। আমার বিয়ের পরে শুনেছিলাম, সে নাকি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

না বোন, উপপত্নীদের জন্য মার জীবন দুর্বহ হয়ে উঠবে কেন ? এ তো বংশের রীতি। সম্ভ্রান্ত বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য ওসব প্রয়োজন। আর বাবা মাকে ভাল না বাসুন, ভক্তি তো করতেন। সংসারের ভার মার মাথার ওপর চাপিয়ে

দিয়ে তিনি এখানে ওখানে আমোদ করে বেড়াতেন। মাও ওসব নিয়ে তাঁকে ঘাঁটাতেন না। তিনি সংসার আর ধর্ম্ম নিয়ে দিন কাটাতেন।

বোন, এই তো আমাদের পরিবারের কথা শুনলে,—এখন বলতো, মনের এতখানি সংস্কার নিয়ে পশ্চিমী আবহাওয়ায় মানুষ স্বামীর ঘর কি করে করবো? তাই তো মার এত শিক্ষা, এত উপদেশ বৃথাই হলো! স্বামীর ঘরে এসে মাঝে মাঝে ভাবতাম,—প্রসাধনের চটকে, নীল কামিজের জেল্লায় স্বামীর চোখ ধাঁধিয়ে দেব। চুলে গুঁজবো যুথীর মালা, পায়ে সাটীনের জুতো। যখন তিনি আসবেন, এই বেশে এগিয়ে যাব তাঁকে বরণ করতে—দেখি, তাঁর মন জয় করতে পারি কি না! কি হলো বোন? তিনি চেয়েও দেখলেন না। তাঁর চোখ পড়লো টেবিলে একরাশ বই আর খাতার ওপর! না, আমি তাঁর কাছে কেউ নই!

মনে হয়, বিয়ের আগে একটি দিনের কথা। পুরোনো দারোয়ানকে দিয়ে মা দুখানি চিঠি পাঠালেন সেদিন। একখানা বাবার, আর একখানা আমার হবু শ্বাশুড়ীর নামে। ঝি-চাকররা কাণাকাণি করতে লাগলো! শুনলাম, আমার বাকদত্ত স্বামী না কি আমি অশিক্ষিত বলে, আমি পা ছোট করেছি বলে—এ-বিয়ে ভেঙে দিতে চান! কাঁদলাম। দাসীরা সান্ত্বনা দিয়ে বললো, 'না গো, না তোমার কথা নয়, টা-ওদের মেয়ের কথা।'

এখন তো মনে হয়, আমার কথাই তারা বলেছিল। কিন্তু আমি কি অশিক্ষিত? গৃহস্থালী বা চেহারার দিক দিয়ে তো খারাপ নই! আর ছোট্ট পা? ওমা, পা ছোট্ট হবে না তো কি চাষার মেয়ের মত ধ্যাবড়া, বিশ্রী পা হবে! না, না, আমার কথা তারা বলে নি, নিশ্চয়ই আর কারো কথা!

মার কাছে বিদায় নিয়ে যখন স্বামীর ঘরে যাওয়ার জন্য লাল রিক্সায় চেপেছিলাম, তখন কি একবারও ভেবেছি স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারবো না? হোন না পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত, আমার এমন রং, এমন নাক, মুখ চোখ—তাঁর সোহাগ পাব না!

পানোৎসবের সময় লাল সিল্কের ওড়নাটা একটু তুলে তাঁর পানে তাকালাম। বিদেশী পোশাক তাঁর পরনে—কই তেমন বিশ্রী তো লাগলো না। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে তো একটুও উষ্ণতা নেই! অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রথা মত একসঙ্গে পান করলাম। পূর্বপুরুষের স্মৃতি-ফলকের উদ্দেশ্যে নমস্কার করলাম, তাঁর বাবা-মাকে প্রণাম করলাম। আমি হলাম তাঁদের কুলের বধূ, তাঁদের মেয়ে। কিন্তু স্বামী—স্বামী আমার পানে ফিরেও তাকালেন না।

বাসর ঘরের নিরালায় একাই শুয়েছিলাম। সমস্ত জীবন ধরে যে-মুহূর্তটির কথা ভেবেছি, সেই মুহূর্তটি ঘনিয়ে এলো। স্বামী ঘরে এসে ঢুকলেন। তখনো বিদেশী পোশাক তাঁর পরনে। এগিয়ে এসে মুখের ওড়নাখানা খুলে আমার পানে তাকালেন। কি গভীর তাঁর চোখের দৃষ্টি! কেমন ভয়

ভয় করতে লাগলো। তিনি আমার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিলেন। সমস্ত দেহে উষ্ণতা অনুভব করলাম। আজ থেকে আমি তাঁর স্ত্রী!

মার উপদেশ মনে পড়লো ঃ—'নির্জীব হয়ে পোড়ো স্বামীর স্পর্শে—মদের তলানির মত নির্জীব, মধুর মত স্পর্শোষ্ণ নয়। তা'হলে চিরদিন তোমার প্রতি স্বামীর কামনা অটুট থাকবে।'

মার উপদেশ স্মরণ করে কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। তিনি এইবার হাত ছেড়ে দিলেন, তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন। কি বললেন জান?

"যা ভেবেছিলাম! দু'টি অজানা মানুষের মিলন কখনো সম্ভব নয়, সম্ভব হতে পারে না। বাবা-মার খেয়ালের বশে তুমি আর আমি হলাম স্বামী-স্ত্রী। নিজেদের কোনো ইচ্ছে নেই, যেন খেলার পুতুল। যাক্, শোন, আমাদের সুমুখে রয়েছে অফুরন্ত জীবন, আমরা তাকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে পারি। তুমি আমাকে সাহায্য করবে বল, বল? তুমি আমার দাসী নও, তুমি আমার স্ত্রী, আমার বন্ধু।"—বাসর রাতে এই কথা শুনলাম আমার স্বামীর কাছে! প্রথমে বুঝতে পারি নি। আমি তাঁর বন্ধু—শুনে অবাক হলাম! স্ত্রী তো দাসীই! এ তিনি কি বলছেন? এ যে সমাজ ও জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ!

তরল আগুনের মত তাঁর কথাগুলো পোড়াতে লাগলো। ইচ্ছে ছিল না তাঁর? জন্মাবার পর থেকে তো তাঁকেই স্বামী

বলে জানি। তবে কি সেই যে বিয়ে ভেঙে দেয়ার কথা শুনেছিলাম, তা' সত্যি !

বোন, কি কপাল বল দেখি !

উত্তর দেয়ার সাধ্য কি ? অপ্রকাশের ব্যথায় শুধু হাত তু-খানা মোচড়ান ছাড়া উপায় রইলো না। তিনি নিজের হাতখানা আমার হাত তু-খানার ওপর রেখে বললেন,

"জানি, তুমি আমার কাছে মনের কথা খুলে বলতে পারবে না। —না, না, তুঃখ কোরো না—এ তোমার সংস্কার, তোমার শিক্ষা। শোন, কথা বলতে আমি চাই না, শুধু একটু আশীর্ব্বাদ করবো। মাথা নোয়াও লক্ষ্মিটি।"

তাঁর শান্ত দৃষ্টি আমার চোখের ওপর, মাথার ওপর নেমে এলো তাঁর হাত। কৈ মার শেখানো বুলিতো কোনো কাজেই এলো না !

হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, "তুমি এখানেই শোও, আমার আর একটি কথার পর আমি আজকের মত বিদায় নেব। শোন, ভয়কে জয় করতে হবে তোমার, তবে তো আসবে শান্তি, ঘুমোও লক্ষ্মিটি। আমি পাশের ঘরেই আছি।"

তিনি চলে গেলেন।

বাড়ী ছেড়ে একা কখনো কাটাই নি। কি ভয়ই করতে লাগলো। দৌড়ে দোর অবধি গেলাম! মার কাছে যদি যাই ? বন্ধ দরজায় হাত দিতেই মনে হলো, সে পথ আর নেই। একে ত পথ চিনি না, তারপর যদি কোনো রকমে

বাড়ী গিয়ে পৌঁছুনো যায়, তো এ পোড়া মুখ দেখাবো কি করে? মা কি বলবেন? হয়তো, না, হয়তো নয়, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে আবার স্বামীর ঘর করতে পাঠাবেন! আমি তো আর তাঁর কেউ নই!

কি আর করবো? বিয়ের পোশাক খুলে ভাঁজ করে রেখে মশারী-ঢাকা বিরাট পালঙ্কের ওপর শুয়ে পড়লাম। চারদিক নিঝুম। গা-টা কেমন ছম্‌ছম্‌ করছিল, কানে বাজছিল অর্থহীন প্রলাপের মত স্বামীর কথাগুলো। কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে নেই।

ভোরে উঠে অপরিচিত বিছানায় নিজেকে দেখে চমকে উঠলাম। এতক্ষণ তো সব ভুলেছিলাম। এবার দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়লো, বিয়ের কথা, স্বামীর কথা···। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম। ঝি গরম জল নিয়ে এলো, কুশল জিজ্ঞাসা করলো। আত্মসম্মানবোধ চাড়া দিয়ে উঠলো, মার মেয়ে তো! বললাম, "উনি পাশের ঘরে আছেন, ওঁর ওখানে দিয়ে এসো।"

লালরঙের পোষাক ঝলমল করে উঠলো।

বোন,

অনেকদিন, তারপর কাটলো। স্বামীর পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এখন আমরা আলাদা বাসায় আছি।

বাড়ী ছাড়বার মূলে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ। না, না, এমন কিছু ঘটনা নয়। বিয়ের গোলমাল চুকে গেলে ভাবলাম, শ্বাশুড়ীর একটু আদর যত্ন করা দরকার। তাই একদিন ভোরে চাকরদের দিয়ে একঘড়া গরম জল করিয়ে শ্বাশুড়ীর কাছে গিয়ে বললাম, "মা, আপনার স্নানের জল এনেছি।"

তিনি তখন সাটীনের লেপের নীচে। কোনো রকমে সেখান থেকেই মুখ-হাত ধোয়া সারলেন। ঘড়া এবার সরিয়ে নিয়ে যাব, ওমা, মশারী না কিসে বেঁধে সে যা কাণ্ড! জলে শ্বাশুড়ীর বিছানা ভেসে গেল। ভয়ে তো কাঠ হয়ে গেলাম! শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "যেমন ধিঙ্গী বউ, তেমনি তার চলা-ফেরা!"

কোনো রকমে চোখের জল সামলে বেরিয়ে এলাম। আমারই তো দোষ। বেরিয়ে যখন আসি, দেখি স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন। মুখখানা কেমন ভার ভার। ওঁর মাকে খুশী করতে পারি নি বলে উনি হয়তো রেগেছেন। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, ঘড়াটা চলকে—

—"তোমায় দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু বাড়ীতে এত ঝি চাকর থাকতে তুমি এসব করতে গেলে কেন?"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, মার উপদেশে শ্বাশুড়ীর পরিচর্যা করতে গিয়ে আমিই গোল বাধিয়েছি। শ্বাশুড়ীর

পরিচর্য্যা, তাঁর কাছে থাকা—আমারই কাজ। কিন্তু তিনি বলতে দিলেন কোথায় ?

বাড়ী ছাড়বার হুকুম হলো। কিন্তু মুখের কথায় তো আর ছেড়ে চলে আসা যায় না। স্বামীর বাবা (আমার শ্বশুর) তিন তিনবার তাঁর সাদা দাড়ি চুমড়ে বললেন, "এত তোমারই বাড়ী। কোন্ দুঃখে ছাড়বে ? তোমার খাওয়া পরার ভাবনা নেই। স্বচ্ছন্দে বসে বই পড়, আমোদ আহ্লাদ কর। বৌমা তোমার সন্তানের মা হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন। তিন পুরুষ এক ভিটেয় থাকা, এত ভগবানের আশীর্ব্বাদ।"

আমার স্বামী অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "বাবা আমি কাজ চাই। পশ্চিমের সব চাইতে বড় ডিগ্রী আমি পেয়েছি, চুপ করে বসে থাকবার জন্য নয়। আর ছেলের বাপ হওয়াও আমার জীবনের প্রধান কাম্য নয়। আমি চাই আমার বিদ্যাকে দেশের ও দশের কাজে লাগাতে,—সেই তো আমার সফলতা। একটা কুকুরও সন্তানের জনক হতে পারে, মানুষ হয়ে যদি তাই করবো, তা'হলে তাতে আমাতে প্রভেদ কোথায় ?"

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাপ-ছেলের কথাবার্তা শুনে শিউরে উঠছিলাম। বিদেশী শিক্ষা না পেলে এমন করে বাপকে অপমান করতে সাহস করতেন কি ? এই তো পশ্চিমী শিক্ষার ফল! বিদায় নেয়ার সময় বোধ হয় রাগ

পড়ে গিয়েছিল। স্বামী তখন খুব ভদ্রভাবেই বললেন, তিনি যেখানে যে-ভাবে থাকুন না কেন, পুত্রের কর্তব্য তিনি করবেনই।

আমাকে শ্বশুরের ভিটে ছাড়তে হলো।

এমন বাসাও তো দেখি নি জন্মে! একফালি উঠোন নেই। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ঘর, আর তার চার পাশে ছোট ছোট ঘর। একপাশে সিঁড়ি; মাগো উঠতে গেলে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে! কাঠের রেলিঙটা আঁকড়ে ধরে একপা, একপা করে সেদিন তো উঠলাম। জামায় খানিকটা রঙ্ লেগে গেলে, জামাটা তাড়াতাড়ি বদলে ফেললাম, কি জানি, উনি যদি হাসেন দেখে!

জিনিসপত্র সাজাতেও তো জানি না বাপু! জায়গাই বা কোথায়? বিরাট এক কাঠের টেবিল আর চেয়ার বাবা বিয়ের যৌতুক দিয়েছিলেন। স্বামী খাওয়ার ঘরে সেগুলোকে রাখলেন। বিয়ের খাটটা যে কোথায় রাখবেন ভেবেই পেলেন না। কি আর করবো বোন, ঝি-চাকরের মত বাঁশের খাটিয়ায় শুয়ে রাত কাটাতে হলো। আর উনি লোহার একটা বেঞ্চিতে শুতেন পাশের ঘরে। সময়ে সবই সয়ে গেল বোন্। বড় একটা ঘর কি ছিল না?—উনি সেটাকে বসবার ঘর

করলেন। কয়েকখানা বেতের চেয়ার আর পঞ্জি সিল্কে ঢাকা একটা টেবিল আর খানকয়েক বই সেখানে রইলো। বড়ই বিশ্রী দেখতে হলো, না বোন? বসবার ঘরের দেয়ালে বিদেশী বন্ধুদের কয়েকখানা ছবি আর কি-একটা হিজি-বিজি লেখা কাগজ টাঙিয়ে রাখলেন, শুধোতে বললেন, বড় হরফগুলো তাঁর কলেজের নাম, বাঁকাগুলো তাঁর বিদ্যের পরিচয়। তা' বোন সেও তো কম নয়। আমার স্বামী তা'হলে প্রকাণ্ড বিদ্বান!

পুরোপুরি বিদেশী কেতায় সাজানো বাড়ী। কাচের শার্সী, তার ভেতর দিয়ে আলো এসে পড়তো দেয়ালের গায়, আসবাবপত্রের ওপর। এতটুকু ধুলো জমলেও টের পেতাম। আর পোড়াকপাল। একটু যে পাউডার ঘষবো গালে, ঠোঁটে সিঁদুরে রং লাগাবো, তারো কি যো ছিল! পোড়া রোদ! স্বামী ধরে ফেলতেন, বলতেন, "ছিঃ ওসব ছাইভস্ম মেখো না! স্বাভাবিক সৌন্দর্যের চাইতে বড় সৌন্দর্য আর নেই।"

বাঃ—ওঁর চোখে সুন্দর হব কি করে, যদি সিঁদুর না মাখলাম ঠোঁটে, গালে না দিলাম পাউডার! চুলেও কি তেল দেব না? জরীর জুতো না হয় নাই পরলাম! কি জানি, কি করে যে সুন্দর দেখাবে আমাকে!

জান্‌লা ঢাকবার জন্যে পর্দা তৈরী করতে হুকুম দিলেন স্বামী। কাচের জান্‌লায় আবার পর্দা! কি জানি!

কাঠের মেঝে স্বামীর বিদেশী জুতোর অদ্ভুত শব্দ করতো। স্বামী শব্দ বন্ধ করবার জন্য প্রকাণ্ড একটা পশমী কাপড় এনে মেঝে ঢেকে দিলেন। আমার ত পা দিতেই ভয় হত, কি জানি যদি খারাপ হয়ে যায়। ঝি-টাকে সাবধান করে দিতাম, থুথু না ফেলে! একদিন ওকথা বলতে স্বামী চটে উঠলেন, "কেন তারা কি মেঝেয় থুথু ফেলে নাকি?"

"কোথায় ফেলবে তা'হলে?"

"কেন, বাইরে।"

কিন্তু ঝির পক্ষে সেটা কিরকম অসম্ভব তাতো আর তিনি জানেন না! আমারই তো মুখ থেকে মাঝে মাঝে তরমুজের বীচি কাপড়ের ওপর পড়ে যেত! শেষে তিনি ছোট ছোট বয়েম এনে থুথু ফেলতে দিলেন। নিজে তো রুমালেই ফেলতেন! কি ঘেন্না!

স্বামীর ঘর, না জেলখানা! এক এক সময় মনে হত বোন, এই জেলখানা থেকে যদি পালাবার উপায় থাকতো! কোথায় যাব? মা-তো আর ঠাঁই দেবেন না! দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ দিন এমনিধারা কেটে গেল। দিন-মজুরদের মত উনি তো সারাদিন বাইরে কাজে থাকতেন। সকালে উঠে বেরুলেন, আর এলেন সেই সন্ধ্যেয়! ঝি-টা কি আর ছিল না! কিন্তু ওর সঙ্গে গল্প করতে যাব আমি!

এর চাইতে শ্বশুরের ভিটে ছিল ভাল। দু-চারখানা মুখ তবু দেখা যেত, দু-চারটে কথাও শোনা যেত। কিন্তু একেবারে একা, সমস্ত বাড়ীতে একটা কাক পাখীও নেই। তাই সারাদিন শুয়ে ভাবি। সেও ওই একই ভাবনা—স্বামীর মন পাওয়া।

সারা রাত ভাবনায়-ভাবনায় ঘুমই আসে না। ভোর বেলা উঠে পড়ি। গরম জলে সুগন্ধি মিশিয়ে মুখ-হাত-পা খুব ভালো করে ধুয়ে ফেলি। রোজই মনে হয়, আজ ওঁর চেয়ে ভোরে উঠেছি। ওমা, রোজই দেখি, উনি কখন উঠে পড়তে বসেছেন!

তাড়াতাড়ি চা করে ওঁর ঘরের সামনে এসে হাতল ঘুরিয়ে বন্ধ দরজাটা খুলে ফেলতাম। ওঁর ঘরে ঢুকে চা নামিয়ে

রেখে চুপ করে দাঁড়াতাম। উনি বই পড়ছেন তো, বই-ই পড়ছেন। একবার মুখ তুলে তাকাতেও কি দোষ? কেন যে ছাই ঝিকে পাঠিয়ে সাত সকালে তাজা যূঁই এনে খোপায় গুঁজে ছিলাম! বই পড়াই কি সব, যূঁই-এর গন্ধ ওর চেয়ে খারাপ নাকি! কত দিন তো দেখেছি, বই পড়তে-পড়তে চা-ই জুড়িয়ে হিম হ'য়ে গেছে। বই পড়া ছাড়া ওঁর আর কিছু আছে নাকি!

স্বামীর মন পাবার জন্যে মার সমস্ত উপদেশ কাজে খাটিয়ে দেখেছি, ফল পেলাম কই? চাকর পাঠিয়ে হঙ্-চাউ থেকে বাঁশের কোঁড়, ম্যাগডাবিন মাছ, আদা, বাদামি রঙের চিনি কিনে এনে কত চব্য, চোষ্য রেধে দিয়েছি! উনি নির্বিকার ভাবে খেয়ে গেছেন, ভালো-মন্দ কিছুই বলেন নি। রাতে বিছানায় শুয়ে ভেবেছি, ওগুলো হয়তো তিনি ভালবাসেন না। আচ্ছা, কাল ওঁর মার কাছ থেকে জেনে আসবো, কি খেতে উনি খুব ভালবাসেন। তারপর দিন তাই করেছি, তাতেও কি প্রশংসা পেলাম!

মা ঠিকই বলেছেন। পশ্চিমী হাওয়া লেগে ওঁর ভালো মন্দের বিচার শক্তি উবে গেছে।

না, তারপর আর চেষ্টা ও করি নি। কি হবে? স্বামী আমার কাছে কিছুই চান না।

নতুন বাসায় আসবার প্রায় পনেরোদিন পরে এক সন্ধ্যে-বেলা উনি বই পড়ছিলেন। কাছে গিয়ে দেখি, ওমা সব যে মড়ার ছবি! উনি এসব বই পড়েন! বেতের চেয়ারে ওঁর পাশে বসে পড়লাম। সভ্য-ভব্য হ'য়েছি বোন, হেলান দিয়ে বসি না সবার সমুখে। বসি, যে-কোনো পশ্চিমী কেতা দুরন্ত মেয়ের মত। উনি টেরও পান নি, আমি এসেছি। নিঃশব্দে বই পড়তে লাগলেন। ওদিকে আমি বসেই রইলাম। মার কথা খুব মনে পড়ছিল। এখন হয়ত বাড়িতে ঘরে ঘরে মোমের বাতি জ্বালান হ'য়েছে। উপপত্নী আর তাদের ছেলেমেয়েরা চিৎকার করছে; মা ঘরে বসে আছেন—তেমনি গম্ভীর, বিষণ্ণ-শ্রী। ঝিরা এধার-ওধার করছে থালা-বাসন নিয়ে। এতক্ষণে বোধ হয় খাওয়া হ'য়ে গেছে! দাসীরা এবার কাজ সেরে উঠোনে চাঁদের আলোয় বসে ফিস্ ফিস্ করছে! মা রোজকার হিসেব মেলাচ্ছেন। মোমের আলোর দীর্ঘ ছায়া তাঁর মুখের ওপর পড়ছে।

কি ইচ্ছেই যে করে মার কাছে যেতে! তেমনি পদ্ম আজও ফুটেছে ছোট্ট পুকুরটায়; ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হ'য়ে উঠেছে। মনে পড়ে, এমন রাতে বীণা বাজিয়ে পুরোনো কবিদের কতো বিরহের গান গেয়েছি!

উঠে বীণা বার করলাম। অনেকদিনতো ওতে হাতই দিই নি। ঝিনুক দিয়ে গড়া রাগিণীর মূর্ত্তিটির ওপর হাত বুলোলাম। কত পুরোনো এই বীণা—এখনো ঝক্‌ঝক্

করছে। ঠাকুর্দা ঠাকুমার জন্যে কোয়াঙ্-টাঙ্ থেকে এনেছিলেন।

বীণায় ঘা দিলাম আঙুল দিয়ে। বিষাদের সুর যেন রিন্ ঝিন্ করে উঠলো। এই বীণা, একি আর বিদেশী এই ঘরে বসে বাজান চলে! মনে হয়, কে যেন গলা টিপে ধরেছে সুরের। তার চেয়ে শান্ত রাতের বুকে, নদীর ধারে, মিঠে জ্যোৎস্নায় চল। সুর আকুল করে দেবে। দূর, সে ভাগ্য করে কি এসেছি! এই বন্ধ খাঁচায় বসেই বাজাব। সাঙ্ আমলের একটা সুর বাজালাম!

স্বামী তাকালেন।

"অপূর্ব," তিনি ব'ললেন, "অপূর্ব তোমার বাজনা! তোমাকে একটা পিয়ানো কিনে দেব, তুমি আমাকে শোনাবে।"—তারপর আবার সেই অদ্ভুত বইটায় ডুবে গেলেন।

জানি না কি সে সুর আমার বীণায় ঝঙ্কার দিল। বাজাতে লাগলাম, কখন যে থামলাম জানি না।

"কিউই-লান"! স্বামী ডাকলেন।

আনন্দে বুক খানা ভরে গেল। এই প্রথম উনি আমাকে ডাকলেন। মাথা নীচু করে রইলাম, তিনি ব'ললেন, "পা বেঁধে রাখলে এই অবস্থা হয়।"

চোখ চেয়ে দেখি, একটা কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে পার মত কি একটা এঁকেছেন। উনি কেমন করে জানলেন,

কারো সমুখে পা দেখানো তো চীনে মেয়েদের রীতি নয়! রাতেও তো সবাই সাদা মোজা পরে থাকে!

অবাক হ'য়ে বললাম, "আপনি, আপনি জানলেন কি করে?" উনি উত্তর দিলেন, "আমি যে ডাক্তার। কিউই-লান, নিজেকে আর কষ্ট দিও না। আর চীনের ও প্রথা তো উঠে গেছে। বিশ্রী—বিশ্রী—যত—"

চেয়ারের তলায় পা দুখানা লুকোলাম, বিশ্রী! উনি তো বললেন, কিন্তু এযে চীনে মেয়েদের গর্ব! তাদের কৌলিন্যের পরিচয়! মা ছেলেবেলা থেকে তো আমার পা নিয়ে পড়েছিলেন। গরম জলে ডুবোনো, চেপে-চেপে বাঁধা—এসবতো তিনি দাঁড়িয়ে থেকে করাতেন। কাঁদলে বলতেন, "আজ কাঁদছ মা, কিন্তু একদিন পা দুখানির জন্যেই স্বামীর সোহাগ পাবে।"

স্বামীর সোহাগ না ছাই! উনি তো বললেন, 'বিশ্রী!' কোনোরকমে চোখের জল রোধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ব'লতে পার বোন, কি দিয়ে তাঁর মন ভোলাব? পা-দুখানির সৌন্দর্য দেখে তো তিনি ভুললেন না।

আমাদের প্রথামত দু-সপ্তাহ পরে মার কাছে চলে এলাম। স্বামী কিন্তু আর পা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন নি। আদর করেও আর নাম ধরে ডাকেন নি।

বোন,

এখুনি উঠবে কি? একটু ধৈর্য ধরে শোন না!

কটা দিনতো নেই, তবু বাড়ির ফটকের কাছে এসে মনে হলো, সবই যেন বদলে গেছে! হয়তো আমিই বদলে গেছি! আমি বিবাহিত; চুলের গোছার বদলে বেণী ঝুলছে; কপালের চুল তুলে দিয়েছি। কিন্তু মনে তো কোনো পরিবর্তন নেই! তেমনি ভীরু, নিঃসঙ্গ মেয়ে, তেমনি নিরাশার জাল বুনে চলেছি।

আমাকে রিক্সা থেকে নামতে দেখে সদরের উঠোনে মা এসে দাঁড়ালেন, কেমন যেন বুড়িয়ে গেছেন এই কদিনে! তাঁকে প্রণাম করে, নিজের হাতে হাত তুলে নিলাম। আদর করে চেপে ধরলেন হাত। আগেও এত আদর কখনো পাই নি!

বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়ালাম। তেমনি উপপত্নীদের চিৎকার, ঝি-চাকরদের তেমনি ব্যস্ত হ'য়ে ছোটাছুটি, সবই তেমনি আছে—তবু যেন কোথায় একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওঃ, এতক্ষণে বুঝেছি, এ আমারই পরিবর্তন! আমি আর এ বাড়ির কেউ নই!

মার কাছে এসে বসলাম। তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দু-একটা কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম, “লা-মে কোথায় মা ?”

“তাকে”—মা তামাক টানতে টানতে বললেন, “হাওয়া বদলাতে পাঠিয়েছি।”

তাঁর স্বর শুনে বুঝলাম, লা-মেকে নিয়ে কোনো একটা ব্যাপার ঘটেছে।

সন্ধ্যেবেলা ওয়াঙ্-ডা-মা যখন চুল বেঁধে দিতে এলো আমার ঘরে, তখন সবই শুনলাম। বুড়ী নানা আজে-বাজে গল্পের পর বললে, “তা বুঝি শোন নি! তোমার বাবা আর একটি জুটিয়েছেন। খুব বিদ্বান, শুনেছি জাপানে পড়তো। লা-মে তো এই খবর শুনে এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলো! কানের দুল গিল্‌লো হতভাগি! যায় যায় অবস্থা। ডাক্তার এলো, হাত আর হাঁটুতে ছুঁচ ফুঁড়লো। তোমার দাদা চন্দ্রোৎসবে বাড়ি এসেছিল, সেইতো বিদেশী মেয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলো। বাক্স থেকে একটা বিদ্‌ঘুটে অস্তর বার করে গলায় পূরে দিলে। দেখতে দেখতে দুল বেরিয়ে এল! কী কাণ্ড, কারো তো মুখে রা নেই! শুধু মেয়ে ডাক্তারটা যেন কিছুই হয় নি, এই ভাব দেখিয়ে বাক্স নিয়ে চলে গেল।”

বুড়ীর কাছেই শুনলাম, উপপত্নীরা খুব রেগে গিয়েছিল। কানের দুল গিলে ফেলে—কী অসম্ভব কথা! প্রথমা লা-মেকে বলেই বসলো, “আত্মহত্যাই যদি করবি, দেশলায়ের

বারুদ জোটে নি! অমন মাগ্যি জিনিস ঢুল—তাই কিনা টুপ করে গিলে ফেললি ?”

লা-মে কোনো উত্তর দেয় নি।

এই কাণ্ডের পর লা-মে সারাদিন শুয়ে কাটাত। ভালো করে খেত না, কারু সঙ্গে কথা বলতো না। এই ধকলে ওর সৌন্দর্যও নষ্ট হয়ে গেল। মা দূরে পাঠিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন, নইলে হয়তো গলায় দড়ি দিত!

ওয়াঙ্-ডা-মাই এই সব খবর দিলে। নইলে মার কাছে এসব নিয়ে কথা বলতে যাব কোন সাহসে?

দাদার খবরও ওর কাছেই পেলাম। মা কি পরিবারের কোনো কথা ভাঙেন! বাপের বাড়ি এসেছি; তারপর দিন সকালে গরম জল দিতে এসে ওয়াঙ্-ডা-মা বলে গেল; বাবা নাকি দাদাকে আমেরিকা পাঠাতে রাজি হয়েছেন। আজকাল চীনের বড় বড় ঘরে নাকি ওটা ফ্যাসান দাঁড়িয়ে গেছে। মা একথা শুনে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন। প্রথমে কথাটা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। যখন যাওয়ার দিন সত্যিই ঘনিয়ে এলো, তিনি তিন দিন তিন রাত না খেয়ে রইলেন। তারপর দাদাকে ডেকে বললেন, “তুমি ত মস্ত বিদ্বান! কিন্তু একথা কেউ কি ভুলেও শেখায় নি যে, তোমার রক্তমাংসের শরীর একা তোমার নয়। যাক্ যখন সে সব ভুলে গিয়ে অসভ্য দেশে চলেছ, আমি বাধা দেব না। যাবার আগে, একটি বিয়ে করে তোমার পিতৃপুরুষের বংশরক্ষার

উপায় করে যদি যাও, আমি সুখী হব। অনুরোধ রাখবে? তাহ'লে দেখ, বিয়ের যোগাড় দেখি!

দাদাটা কি একগুঁয়ে! বলতে পারল কিনা, "এখন বিয়ে করার আমার ইচ্ছে নেই! আমি বিজ্ঞান পড়ে জগতের রহস্য আবিষ্কার করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ফিরে এসে তোমার কথা রাখবো, এখন নয়।"

মা বাবার কাছে খবর পাঠালেন, ছেলের বিয়ে দেয়া চাই। বাবা তখন নতুন উপপত্নীর মোহে মত্ত। উত্তর দিলেন না। দাদা নিজের যা খুশি করলো। আমেরিকা চলে গেল।

মার জন্য দুঃখ হয়। বহুদিনের পুরোনো এই বংশ। দাদার যদি বিদেশে ভালোমন্দ কিছু হয়, বংশ রক্ষার কি উপায় হবে? লী-দের মেয়ে দাদার যোগ্য নয় জানি, কিন্তু মার হুকুমের কাছে যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথাই উঠতে পারে না।

দাদার এই অবাধ্যতা আমার মনেও বড় লাগল।

বাড়ি এসেছি আজ সাতদিন। দাদা চলে গেছে। সেদিন রাতে দোরগোড়ায় বসেছিলাম। আবছা আলোয় চাকরদের ছুটোছুটি, ভাজা মাছের গন্ধ, ক্রীসান্থিমাম গাছগুলো—সব

কিছু দেখে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ছিল। আমি এই বাড়ির মেয়ে, আমার সত্তা জড়িয়ে আছে এ বাড়ির প্রতি ধূলিকণায়। আমি ছাড়লেও, এবাড়ি আমাকে ছাড়বে না!

স্বামীর কথা মনে পড়লো। বিদেশী পোশাক পরে বিদেশী কেতায় সাজানো ঘরে বসে আছেন। আমি তাঁর স্ত্রী, কিন্তু তিনি আমাকে চান না। পুরোনো সংস্কারের মতই তিনি আমাকে ঘৃণা করেন। জল চোখের মণিকোঠায় জমে উঠলো। যার বর্ত্তমান এই, ভবিষ্যতে তার কি আছে কে জানে! এমন সময় খাবার ঘণ্টা পড়লো।

মার শরীর অসুস্থ, তিনি শুতে গেছেন। উপপত্নীদের খাওয়া শেষ। একা বসে খাচ্ছিলাম। ওয়াঙ্-ভা-মা এসে জানালো, মা ডেকেছেন।

"তাঁর শরীর না অসুস্থ? কেন ডেকেছেন?"

"কি জানি, কেন ডেকেছেন।" ওয়াঙ্-ভা-মা চলে গেল।

সাটীনের পর্দা সরিয়ে মার ঘরে ঢুকলাম। বিছানায় শুয়ে আছেন। পাশে টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে। কাছে গিয়ে আস্তে ডাকলাম, "মা!"

"কেন মা?"

আমাকে হাত ধরে পাশে বসালেন। অনেকক্ষণ বসেই ছিলাম। অবশেষে তিনি বললেন: "মা, মনে হয়, কি যেন তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ। তোমার মনের সে শান্তি আর

নেই! কেমন উদাস ভাব, চোখ দুটি সারাক্ষণ লাল! কোনো ব্যথা পেয়েছ কি, মা? লুকিও না, বল। যদি সন্তানের জন্য তোমার এই দুঃখ হয়, সে সময় তো যায় নি। তোমার দাদা হয়েছিল আমার বিয়ের দু বছর পরে। ছিঃ এর জন্যে মন খারাপ করে নাকি!"

কি বলবো ভেবে পেলাম না। মশারী থেকে একটা সূতো ঝুলছিল, সূতোটা নিয়ে আঙুলে জড়াতে লাগলাম।

এইবার তাঁর চোখে চোখ পড়লো। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। হু হু করে চোখ দিয়ে জল গড়াল। মার লেপের ভেতরে মুখ গুঁজে বললাম, "কিছুই বুঝি না। তিনি আর আমি নাকি সমান! সেদিন বললেন, আমার পা দু খানা বিশ্রী—স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।"

মা উঠে বসলেন। "কি—তুমি তার সমান—স্ত্রী স্বামীর সমান! এমন আজগুবি ব্যাপার কোথায় দেখেছে সে?"

"পশ্চিমে।"

"ওঃ। তারপর পা সম্বন্ধে কি বললে?"

"বিশ্রী!" ফিসফিস করে বললাম।

"—তুমি বোধ হয় যত্ন নাও নি। বিশ জোড়া জুতো দিয়েছি, কোনটা কখন পরলে সুন্দর দেখাবে সেও আমি ব'লতে যাব ধিঙী মেয়েকে!"

ভয়ে ভয়ে বললাম—"না, তা নয়, তিনি সেদিন এঁকে দেখালেন—লোহার জুতো পরে পায়ের হাড় দুমড়ে গেছে!"

"দুমড়ে গেছে। মেয়েদের পায়ের হাড় কে কবে দেখেছে!"

"উনি যে ডাক্তার।"

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু বেরুল, "পশ্চিমী ভেলকি!"

তারপর অজান্তে সব কথাই বলে ফেললাম। তিনি আমাকে ভালবাসেন না, সন্তান চান না, বিবাহিতা হয়েও আমি কুমারী······সেসব কথা।

মা নিজের ডান হাতখানি আমার মাথার উপর রেখে বললেন—"তোমার শিক্ষায় যে গলদ আছে, এ কথা আমার মনে হয় না। একজন সম্ভ্রান্ত লোকের উপযুক্ত করে আমি তোমাকে গড়েছি। তোমার স্বামী অসভ্য, পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত অসভ্য! কে জানতো মা, এমন হবে! তোমার দাদা যেন সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ডুবে যায়!"

আর ব'লতে পারলেন না। চোখ মুদে এল। শুয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে বললেন—ক্লান্তিতে তাঁর স্বর জড়িয়ে আসছিল—"মা, মেয়েদের জীবনে একটা পথই খোলা আছে, সে স্বামীকে খুশি করা। আমার শিক্ষা তোমাকে ভুলে যেতে হবে, এই আমার দুঃখ। কিন্তু উপায় কি, তুমি তো আমার পরিবারের কেউ নও! তার আগে একবারটি শেষ চেষ্টা করে দেখো, ওর মতি গতি ফেরাতে পার কিনা। যদি দেখ, সে ফিরলো না, তার কথা মত কাজ কোরো।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

অস্পষ্ট স্বরে বললাম, "আমার কি হবে?"

"সময় বদলে গেছে মা। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তোমাকে চলতে হবে। যাও, আমার ঘুম পাচ্ছে।"

দেয়ালের দিকে মা পাশ ফিরে শুলেন।

স্বামীগৃহে ফেরবার দিন এসে গেল।

ভোর হলো। আবার সেই বিদেশী কেতায় সাজানো ঘর, সেই বিধর্মী স্বামী! দশম চন্দ্রের বোধ হয় শেষ সেদিন। জীর্ণ পাতা গাছ থেকে খসে পড়ছিল, বাঁশগাছগুলি কাঁপছিলো হাওয়ায়। উঠোনে খানিকটা পায়চারি করলাম, তারপর পদ্ম দিঘীর পারে গিয়ে দাঁড়ালাম। জুনিপার গাছটা তার জলে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ বসেছিলাম চুপটি করে। ওয়াঙ্ ডা-মা এসে ডেকে নিয়ে গেল। যাবার সময় হয়েছে। ক্রীসান্থিমামের কয়েকটা টব নিয়ে রিক্সায় উঠলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি, উনি নেই। ঝি-কে শুধোতে বললে, কি একটা জরুরী কাজে খুব ভোরেই বেরিয়ে গেছেন। ক্রীসান্থিমামগুলো ওঁর শোবার ঘরে সাজিয়ে রাখলাম, ওঁকে অবাক করে দেব! কিন্তু কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এ ফুল কি আর বিদেশী কেতায় সাজানো বাড়িতে মানায়!

আমিও যেন ঠিক ঐ ক্রীসান্থিমাম ফুলের মতই। সাটীনের সাজে, গালে রঙ মেখে, চুলে মুক্তোর মালা গুঁজে আমাকে কি আর এই বিদেশী পরিবেশের ভিতরে মানায়!

স্বামী অনেক রাতে ফিরলেন। ক্লান্তিতে তখন গা এলিয়ে দিয়েছি! কুশল প্রশ্ন করেই উনি চাকরকে খাবার আনতে হুকুম দিলেন। সারাদিন খেটেছেন, পেটে বুঝি একটি দানাও পড়ে নি!

খাবার টেবিলে একটি কথাও বলি নি, উনি ও না। খাওয়া শেষ করে ব'ললেন, "বসবার ঘরে এস।"

বসবার ঘরে এসে তিনি বাবা-মার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম, আমার কথা শুনছেন না। চুপ করে গেলাম। অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে তিনি ব'ললেন, "কিছু মনে কোরো না। তুমি ফিরে এসেছ, খুব খুশিই হয়েছি। কিন্তু দু-দণ্ড কথা কইবার শক্তি নেই। কেবলই মনে হচ্ছে, কুসংস্কার আর অজ্ঞতা সমাজের কি অপরিমেয় ক্ষতিই করেছে। আজ হলো তাদের সঙ্গে লড়াই, কিন্তু জিততে পারলাম না।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "তুমি ও পাড়ার ইউ-দের চেন তো? তাদেরই মেজবৌ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিছলো। শ্বাশুড়ীর অত্যাচারেই হবে। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। বাঁচাতে পারতাম, তখনই ধরা পড়েছে কিনা। ওষুধগুলো ঠিক করছি, এমন সময় বাড়ির কর্তা—তিনি মদের ব্যবসা করেন, এলেন, এসেই বললেন, তাঁর বাড়িতে তিনি বিদেশী ওষুধ ঢুকতে দেবেন না, দিশী ব্যবস্থা করবেন। পুরুত ডেকে নিয়ে আসা হলো, তারপর সুরু হলো ঘণ্টা বাজিয়ে মেজ বৌয়ের আত্মাকে

ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা! সবাই ধরাধরি করে তাকে বসিয়ে নাকে-মুখে তুলো গুঁজে দিলে। বা! আত্মাকে ফিরিয়ে আনবার কি সুব্যবস্থা!"

বললাম, "ঐতো রীতি, কয়েকটি আত্মা বেরিয়ে গেলে, আরগুলোকে ধরে রাখবার জন্য অমনি করে তুলো গুঁজে দিতে হয়।"

আলোর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ব'ললেন, "তুমি, তুমিও এ কথা বল?"

অপ্রতিভ হলাম। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, "বৌটি কি মারা গেছে?"

"মারা গেছে! তোমাকে যদি এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাখা হয়, তুমি বাঁচবে?" আমার হাত দু-খানা নিজের মুঠোয় শক্ত করে ধরে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখে চেপে ধরলেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল! নখ দিয়ে রুমালখানা ছিঁড়ে ফেলে হাঁপাতে লাগলাম। উনি হাসলেন। তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। চন্দ্রমল্লী যেন আরও ম্লান হয়ে গেছে।

রাতে সাটীনের পোষাক ভাঁজ করে রেখে দিলাম। এতদিন যা' শিখেছি ভুল, ভুল! ফুলের মত, আফিমের নেশার মত ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যে ওঁর মন পাওয়া যাবে না। ওঁর উপযুক্ত হতে হবে। মা না দেয়ালের দিকে মুখ করে ক্লান্ত স্বরে বলেছিলেন,

"সময় বদলে গেছে!"

সবই তো হলো। পা খুলতে বড় লজ্জা হত। অবশেযে স্বামীর বান্ধবী শ্রীমতী লিউ-ই আমাকে উদ্ধার করলেন। শুনেছি, তিনি একটি নতুন বিদেশী স্কুলে পড়ান।

তিনি. যেদিন প্রথম এলেন, বাড়িতে ঘটা পড়ে গেল। আমাদেব বিবাহিত জীবনের প্রথম অতিথি তিনি! ঝিকে বলে বাজার থেকে ছ রকম কেক, তরমুজের বীচি, ভালো চা আনিয়ে রাখলাম, পরলাম সাটীনের পোশাক, কানে মুক্তোর দুল। বাড়িটা এত ছোট! ভাবলাম, তিনি বিশ্রী না মনে করেন! আর স্বামীর ঘরটা হ'য়ে আছে বই খাতার জঙ্গল! উনি বেরিয়ে গেলে একটু গোছ-গাছ করে রাখবো। কিন্তু বেরোবার নামটিও নেই। সেই সকাল থেকে ঘর নিয়েছেন। কি আব করি, থাকুন না উনি, একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি ভেবে যেমনি ঢুকেছি, অমনি ঘণ্টা বাজলো! স্বামী দৌড়ে গেলেন। আর কি গোছাবার সময় আছে! ওঁদের কথা শুনতে পেলাম। পর্দাটা একটু ফাঁক করে দেখছিলাম, কী অদ্ভুত! উনি শ্রীমতী লিউ-ইর হাত ধরে নাড়ছেন। ওঁর মুখ হাসিতে ভরে গেছে! ওঃ আমার কাছে যখন থাকেন, মুখ অমন গোম্‌রা করে থাকেন কেন?

মেয়েলি কৌতূহল নিয়ে, ঈর্ষাও বলতে পার বোন, লিউ-ই কে দেখলাম। কি এমন অপরূপ সুন্দরী! পরনে

মোটা সিল্কের ঘাঘরা, তার ওপর ধূসর রঙের ছোট্ট কোর্তা। পা দুখানি মর্দদের মতো, জুতোও পরেছে তেমনি। আর বেহায়া মেয়েদের মত খিল খিল করে হাসে!

বসে বসে স্বামীর সঙ্গে কত গল্প করলেন। আমি তার কি ছাই বুঝবো! শুধু স্বামীর মুখের পানে চেয়েছিলাম। ইস্! খুশি যেন উছলে পড়ছে!

সে রাতে খাওয়ার পর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে এসেছিল?"

"উনি?" স্বামী বললেন, "উনি মেয়েদের বিখ্যাত কলেজ ভাসার থেকে পাস করেছেন। মেয়েদের যা হওয়া উচিত, উনি ঠিক তাই। শুধু বিদ্যাই নয়, শিশু পালন, গৃহস্থালীতেও উনি পটু। ওঁর তিনটি ছেলে মেয়ে, দেখলে চোখ জুড়োয়!"

সেই মুহূর্তে লিউ-ইর প্রতি মন ঘৃণায় ভরে গেল। আর উনিই বা কি? সৌন্দর্যের কোনো দাম নেই, শুধু বিদ্যা আর বিদ্যা!

কি জানি কেন বললাম, "উনি কিন্তু সুন্দরী নন?"

"মানে," হেসে বললেন, "মোমের পুতুলটি নন, বল। কিন্তু দেখেছ ওঁর সামর্থ্য, ওঁর মুখে বুদ্ধির দীপ্তি—তাই তো ওঁর সৌন্দর্য!"

রাগে দুঃখে পাগল হয়ে গেলাম। পারব না, অমন স্বামীর মন যোগাতে! আবার মার কথা মনে পড়লো: "স্বামীর মন যোগানই তোমার কর্তব্য।"

স্বামী কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ বললাম, "আমি পা খুলতে চাই।"

স্বামী একটু আশ্চর্য হলেন।

তা আশ্চর্য্য হন না। আমাকে আধুনিক হতে হবে, স্বামীর মনের মত হতে হবে।

অতীতের পানে যখন তাকাই, এই দিনটিকে আমার শুভদিন বলে মনে হয়। এই দিনটি থেকেই আমার বিবাহিত জীবনের মোড় ঘুরলো। স্বামী আমার কথা না ভাবুন, অন্তত সদয় তো হলেন।

আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তখন না ছিল আমাদের চিন্তাধারায় মিল, না ছিল আমাদের রীতিনীতিতে ঐক্য। যখনই কথা বলতে হত, লজ্জায় এতটুকু হয়ে যেতাম। স্বামীও যেন কোনো অচেনা লোককে বলছেন, এমনি করে কথা কইতেন। এবার থেকে কিন্তু সে-বাধা রইলো না। স্বামী আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমার ভীরু প্রেম এতদিন শুধু ভয়ে কেঁপেই মরছিলো। সে পেল পরিপূর্ণতা।

পা খোলবার কথা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভেবেছিলাম দু-একটা ডাক্তারী পরামর্শ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হবেন। অবাক কাণ্ড! দেখি, নিজে গরম জল আর সাদা কাপড়ের পট্টি নিয়ে এলেন! ও মা! শুধু দেখা নয় ছোঁবেন নাকি! যখন হাঁটু গেড়ে বসলেন, ক্ষীণ আপত্তি তুললাম।

হেসে বললেন, "এখন তো স্বামী নই, ডাক্তার। লক্ষ্মী মেয়েরা ডাক্তারকে বাধা দেয় না।"

তবুও রাজি হতে পারলাম না।

গম্ভীর হয়ে বললেন, "জানি, তোমার সংস্কার তোমায় বাধা দেবে। কিন্তু তারাই তো মানুষ যারা সংস্কারকে জয় করতে পারে।"

পা দু-খানা কোলের ওপর টেনে নিয়ে জুতো-মোজা খুলে ফেললেন।

"কি কষ্টই পেয়েছো!" মৃদু স্বরে বললেন, "বেচারী, বেচারী! কিন্তু কেন এই সংস্কারের পূজো, আমায় বলবে কি?"

চোখের জল রোধ করতে পারলাম না। পুরাতন সংস্কার ভেঙে তিনি নতুন সংস্কারে আমাকে জড়াতে চাইছেন। কিন্তু ভয় হয়, কি জানি কি হবে!

অসহ্য বেদনা! পা বাঁধাও কষ্ট, খোলায়ও তেমনি। কিন্তু কদিনেই যেন মনে হলো সঙ্কুচিত পা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে; রক্ত চলাচল সুরু হয়েছে।

পুরানো সংস্কার তো আর একদিনে উড়িয়ে দেয়া চলে না! মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত, আবার বাঁধি পা! স্বামী কি

বলবেন ? রাতে যখন অসহ্য হত ব্যথা, বালিশে মুখ ঘসে কাঁদতাম। স্বামী মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন ! আদর করে কত কথা কইতেন, গল্প বলতেন। বোন, আমার সৌন্দর্য তাঁকে অভিভূত করতে পারে নি, আমার দুঃখ তাঁকে কাঁদালো। কখনো কখনো ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতাম। অশ্রুনিরুদ্ধ স্বরে বলতেন, "কেঁদো না কিউ-ই-লান। মনে কর, আমরা যুগার্জিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। আমাদের জিততে হবে।"

"না," ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতাম, "সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ নয়। আমি করছি আপনারই জন্য।"

ছিঃ, কি করে এ-কথা বলেছিলাম !

উনি হাসতেন। ঠিক অমনটি হাসি দেখেছিলাম, শ্রীমতী লিউ-ইর সঙ্গে যে-দিন গল্প করছিলেন। এতো ব্যথায় ওইটুকুইতো আমার সান্ত্বনা !

পা দু-খানি যেন নতুন করে পেলাম। মন খুশীতে ভরে গেল। স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি। একদিন তো দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। স্বামী অবাক হয়ে গেলেন। হাসতে হাসতে বললেন,

"তাহলে সেরে গেছ দেখছি !"

—"কিন্তু শ্রীমতী লিউ-ইর মত হয় নি।"

—"সে কখনো হবে না। বাড়বার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে কিনা!"

দুঃখ হলো। থাক্ কি আর হবে! শ্রীমতী লিউ-ইর মতো জুতো কিনে নিয়ে এলাম। দু-ইঞ্চি লম্বা জুতো জোড়া, কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না যে আমার পা ছোট।

এবার স্বামীকে ধরলাম, শ্রীমতী লিউ-ইর ওখানে বেড়াতে যাব।

স্বামী বললেন, "কালই চল।"

ওমা, তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন! এতো রীতি নয়! কি আর করি, ওঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা!

পরদিন লিউ-ইর বাড়িতে স্বামী আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করলেন। তবে একটু অবাক হলাম বোন, যখন শ্রীমতী লিউ-ইর ঘরে আমায় আগে ঢুকতে বলে নিজে পেছনে পেছনে গেলেন।

বাড়ি ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, "মেয়েরা পুরুষদের থেকে সব বিষয়ে ছোট বলেই বুঝি আগে ঢোকার নিয়ম?"

"না, না, তা নয়"—আমাকে বুঝিয়ে বললেন, "এ হচ্ছে পশ্চিমের প্রচলিত ভদ্রতা।"

আমাদের দেশের বাইরে আবার ভদ্রতা, সভ্যতা—ওসব আছে নাকি! স্বামী বললেন, তাদেরও ইতিহাস আছে, সংস্কৃতি আছে। তিনি আমাকে সে-সব পড়ে শোনাবেন।

আরো আধুনিক হবো। খানিকটা তো হয়েছিই। পুরুষের মত জুতো পরেছি; বেরোবার সময় মুখে আর সিঁদুর মাখি না, চুলেও মুক্তো গুঁজি না।

আমি আধুনিকা, শ্রীমতী লিউ-ইর মত বিদ্যে না থাকলেও আধুনিকা তো বটেই!

জীবনের সঙ্গে নূতন করে পরিচয় হলো। সন্ধ্যেবেলা স্বামীর কাছে দেশ-বিদেশের ইতিহাস শুনে কাটতো। কি বিদ্‌ঘুটে নাম, আর মজার মজার ঘটনা! স্বামীকে তো একদিন বলেই ফেললাম, "যেমন নাম, তেমনি যত কাণ্ড! হাসতে হাসতে ফিক ধরে।"

"আমরাও," স্বামী উত্তর দিলেন, "ওদের কাছে সমান হাস্যকর।"

"আমরাও!" অবাক হয়ে গেলাম।

"হাঁ, আমরাও। তাদের কথা একবার কান পেতে শুনো, তাদের লেখা বই পড়ে দেখো। আমাদের পোশাক, মুখোসের মত ভাবলেশহীন মুখ, আমাদের খাবার—এসব নিয়ে কত ঠাট্টাই ওরা করে। তারা ভাবতেই পারে না যে, আমরা সংস্কারমুক্ত হতে পারি, আমরাও মানুষ।"

শুনে আশ্চর্য হলাম। উত্তেজিত হয়ে বললাম, "ওরা তো

সভ্য হতেই আমাদের দেশে ছুটে আসে, আবার আমাদের বলে অসভ্য!"

"কার কাছে শুনেছ এ কথা?"—উনি হাসলেন।

"মার কাছে!"—মৃদুস্বরে বললাম।

"তোমার মা ভুল বুঝেছেন। বরং ওরা তো বলে সভ্যতা শেখাতেই ওরা দলে দলে আসে এ দেশে। কিন্তু দু-পক্ষই ভুল করে। তারা জানে না, সভ্যতা কোনো জাতির নয়, সভ্যতা পৃথিবীর। প্রতি জাতিকে প্রতি জাতির কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে হয়।"

বিদেশীদের কথা, তাদের আবিষ্কারের কথা শুনতে খুব ভালো লাগতো। স্বামীর কাছে শুনতাম, ওরা নাকি জলের কল আবিষ্কার করেছে, হাতল টিপলেই নল দিয়ে জল পড়ে। জ্বালানি কাঠ লাগে না, এমনি উনুন, উড়োজাহাজ, আরো কত মজার জিনিস তারা তৈরী করেছে।

স্বামীকে একদিন ওদের আবিষ্কার প্রসঙ্গে বললাম, "এসব তো ভেল্‌কি! মার কাছে রূপকথা শুনতাম, পরীরা জল, আগুন, মাটি নিয়ে কতো আশ্চর্য খেলা দেখায়!"

"এ বিজ্ঞান," স্বামী হাসলেন, "ভেল্‌কি নয়।"

বিজ্ঞান! তাহলে দাদারই মত উনি বিজ্ঞান পাগল! দাদা এই বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে কোথায় দূর আমেরিকায় গিয়ে পড়ে আছে! দেখতে হবে তো বিজ্ঞান কি জিনিস!

তিনি বইয়ের তাক থেকে কতগুলো ছবিওলা বই বার করলেন। তারপর বোঝাতে লাগলেন।

এখন তো রোজই বিজ্ঞানের কথা শুনছি। দাদা কেন যে মার অবাধ্য হয়ে চার সাগরের পারে চলে গেল এখন কতকটা বুঝতে পারি। শুনতে শুনতে আমিই তো নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাই। মস্ত পণ্ডিত হয়েছি! কিন্তু কাকে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেই—বলতো? একদিন রাঁধুনীকে ডেকেই বললাম,

"জানো, পৃথিবীটা গোল। আমাদের দেশটাই সব নয়, এমনি হাজার হাজার দেশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।"

সে তো পাগলই ভাবলো! ফ্যাল্‌ফ্যাল করে খানিকটা চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "কে বলেছে?"

ওঁর নাম করলাম।

চুপ করে গেল। তারপর অস্পষ্ট স্বরে ব'ললে, "কি জানি, প্যাগোডায় উঠতে দেখেছি হাজার মাইল ধরে মাঠ, পাহাড় আর নদী বিছিয়ে আছে। গোল বলে তো কখনো মনে হয় নি। আর আমাদের দেশটাই তো সব, শাস্ত্র বাক্যি তো আর হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না!"

হেসে বললাম, "আমার তো এই ধারণাই ছিল, কিন্তু উনি কত বই পড়েন, উনিই বলেছেন, পৃথিবী এত বড় যে আমাদের যখন সূর্য ওঠে, চারসাগরের পারে তখন নিশুতি রাত।"

রাঁধুনী আর কথা বললে না, চলে গেল।

তা বোন, ওর আর দোষ কি ? আমি তো ওর মতই মূর্খ ছিলাম ! ভাবতাম, সৃষ্টিকর্তা পান-কু আমাদের জন্যই চাঁদ, সূর্য, তারা এসব সৃষ্টি করেছেন। স্বামীর কাছে প্রথম শুনলাম, ওরা সমস্ত পৃথিবীর, আমার নয়। বিশ্বাস করবো না কেন বোন, উনি তো মিথ্যে কথা বলেন না।

কি করে স্বামীর সোহাগ পেলাম, জিজ্ঞেস করছ বোন?

ওমা তাও বুঝতে পারছ না!

হিম-শীতল পৃথিবী যেমন করে সূর্যের উষ্ণতা উপলব্ধি করে, সমুদ্র যেমন করে জানে চন্দ্রের আকর্ষণের কথা।

দিনগুলো যেন প্রজাপতির মত রঙীন ডানা মেলে দিল। পিতৃপুরুষের গৃহের কথা ভুলে গেলাম। নিঃসঙ্গ লাগবে কেন বোন, স্বামীর সাহায্য পেলাম যে!

স্বামী রোগী দেখতে চলে গেলে বসে বসে তাঁর কথাগুলো ভাবতাম; বইয়ের পাতা ওলটাবার সময় তাঁর স্পর্শ অনুভব করতাম। রাতে বাড়ি ফিরে যখন বই পড়ে শোনাতেন, চুরি করে কত দিন ওঁর মুখের পানে তাকিয়েছি!

বর্ষার নদী যেমন শীতের জীর্ণ পয়ঃনালাকে উদ্দাম জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়, রিক্ত প্রান্তরকে শ্যাম করে তোলে, তেমনি করে আমার স্বামী তাঁর গভীর ভালোবাসায় আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করলেন।

বোন, সে আনন্দ কি করে তোমার কাছে প্রকাশ করবো। সে যে মনের রঙে ছোপানো রূপকথা—ভাষার নয়,

অনুভূতির! বছর ঘুরে আসতেই আমার গর্ভে এল সন্তান, ওঁর সন্তান!

স্বামীকে জানালাম, পত্নীর কর্তব্য করেছি। আমার গর্ভে তাঁর সন্তান জন্ম নিয়েছে। স্বামী তাঁর নিজের বাড়ীতে খবর পাঠালেন। মার কাছে কোনো খবর পাঠাই নি, নতুন বছরের গোড়ায় তাঁর কাছে যখন যাব, তখন বলবো। শুনে খুব খুশি হবেন নিশ্চয়ই!

এতদিন স্বামীর পরিবারের একটা কাকপাখীও ডেকে জিজ্ঞেস করে নি। দু-দুবার নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখেছি শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণ আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেন নি। এবার কিন্তু দেখতে-দেখতে পরিবারের একটা কেউ কেটা হয়ে উঠলাম। স্বামীর ভাইদের কারো ছেলেপুলে নেই। আমার ছেলেই হবে বিষয়ের উত্তরাধিকারী, বংশে বাতি দেবে—তাই না এত ঘটা করে আদর। কিন্তু ছেলে কি আর বেশি দিন আমার কাছে রাখতে পারবো? সে তো আমার একার নয়, সমস্ত বংশের! কিউ-ই-ইন্ আমার সন্তানকে তুমিই রক্ষা কোরো!

ঠিক এমনি সময় শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ একদিন ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি, চা খেতে বসেছেন। প্রণাম করতেই হাত ধরে পাশে বসালেন। তারপর বললেন,

"দিব্যি মেয়ে, খাসা মেয়ে!"

এই কথা কটি বলতেই হাঁফিয়ে উঠেছেন। যাক্, সন্তুষ্ট

হয়েছেন বুঝলাম। নিজের হাতে করে চা খাওয়ালেন, তারপর অন্যান্য বৌদের ডেকে পাঠালেন। তারা তো আমার আদর দেখে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছিল। তারা বন্ধ্যা, আদর তো তাদের জোটে নি, লাথিঝাঁটাই প্রাপ্য। বড়টি তো আমার সৌভাগ্য দেখে কপাল চাপড়ে কাঁদতে সুরু করলো। শুনলাম, তার স্বামী নাকি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে। বেচারী! স্বামীকে হয় তো সত্যিই ভালবাসে!

শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রুণ ফেরবার সময় অনেক উপদেশ দিলেন! তার মধ্যে একটা কিন্তু নেহাৎ অদ্ভুত বলেই মনে হলো! বললেন কি জান? "বৌমা, ছেলের জামা-কাপড় তৈরী করতে বসে যেওনা যেন।—তোমরা আজকালকার মেয়ে বাছা, মান না তো কিছুই। কিন্তু আমরা বুড়ো-হাবড়া আমাদের মানতেই হয়। ওতে সয়তানের দৃষ্টি পড়ে! য়্যান্‌ওয়েইতে আমার বাপের বাড়ি; সেখানে নিজের চোখে অমঙ্গল ঘটতে দেখেছি।"

বললাম, "মা, ওকে কি তাহলে ন্যাংটোই রাখবো?"

"বাপের গায়ের জামা-কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রেখো, ছেলে দীর্ঘজীবি হবে! আমার ছ-ছটি ছেলে, তাঁদের বেলাও তাই করেছি।"

বাড়ির বাঁজা বৌয়ের দলও আমাকে উপদেশ দিতে ছাড়লো না। সন্তান হওয়ার পর অমুক মাছ খাও ভাল থাক্‌বে,—এমনি কত কি পরামর্শে আমাকে আছন্ন করে

ফেললো। হিংসেয়ও জ্বলে পুড়ে মরছিল, ঐ করে যদি শান্তি পায়! আহা বেচারীরা!

সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরে ওঁকে সব কথাই বললাম। উনি তো রেগে আগুন! বললেন, "যত সব কুসংস্কার, মূর্খতা! প্রতিজ্ঞা কর, এসব তুমি করবে না, করতে পারবে না। কিউ-ই-লান, প্রতিজ্ঞা কর, নইলে ভবিষ্যতে আর সন্তানের আশা তুমি করো না। আমি জন্ম শাসন করবো।"

কি করবো? ভয়ে ভয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম।

"কাল তোমাকে আমার", শান্তস্বরে তিনি বললেন, "পাশ্চাত্য অধ্যাপকের বাড়ি নিয়ে যাব। আশা করি, তাঁদের শিশুপালন পদ্ধতি দেখে তোমার চোখ ফুটবে। অন্ধ ভাবে তুমি তাঁদের অনুকরণ করবে না, তাঁদের ভালটুকু তুমি গ্রহণ করবে।"

রাজি হলাম। কিন্তু গোপনে আর একটা কাজ করলাম। ভোরে উঠে চাকরকে নিয়ে কোয়াঙ-ইনের মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে এলাম। দেবতা, আমার সন্তানের মঙ্গল করুন, তাকে দীর্ঘ পরমায়ু দিন।

পরদিন তাঁর বিদেশী বন্ধুর বাড়ি আমাকে নিয়ে গেলেন। ভয়ে ঘেমে উঠছিলাম বোন! কেমন একটা কৌতুহলও ছিল মনে। এখন তো হাসি পায়। তুমি যার বন্ধু, সে কিনা বিদেশী দেখে ভয় পেত!

তা কি হবে বোন, এর আগে বিদেশীদের বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, তাদের চোখেও দেখি নি! বাবার কাছে মাঝে মাঝে এদের অদ্ভুত চেহারা, আচার-ব্যবহারের কথা শুনতে পেতাম। মা ওদের কথা বলতেই ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠতেন,—তিনি ওদের কথা বইয়ে পড়তেন, লোকের মুখেও শুনেছিলেন। বাড়ির ভেতর এক দাদাই ছিল এদের ভক্ত। বিয়ের আগে শুনতাম, দাদা নাকি এদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। কি সাহস দাদার! আমাদের ছোটো শহরে তো বিদেশীর উৎপাত তখন একেবারে ছিল না। ঝি মাঝে মাঝে বাজারে দু-একটা দেখে এসে গল্প করতো। ভূতের গল্পের মতই বলতো যন্ত্রের সাহায্যে বিদেশীরা নাকি মানুষের আত্মাকেও বাক্সে পুরে রাখতে পারে।

স্বামীকে একথা বলায় উনি হাসলেন। অপ্রতিভ হলাম খুবই।

অবশেষে বললেন, "আমি তাহলে বারো বছর ওদেশে কাটিয়ে এলাম কি করে?"

"আপনি বিদ্বান, আপনি যাদুবিদ্যা জানেন,—তাই ওরা কিছু করতে সাহস করে নি।"

হেসে বললেন, "তোমাকে এখন বোঝাতে যাওয়া ভুল। তুমিই দেখো, আমাদের সঙ্গে তাদের অমিল কোথায়।"

ওঁর বিদেশী বন্ধুর বাড়ি গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড বাগান! ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে; আর কি পরিচ্ছন্ন! কিন্তু সবই আছে, নেই একটা সোনালি মাছ-ভর্তি পুকুর! এ নিশ্চয়ই ওদের সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাব।

বাড়ির দোরে ঘা দিতেই এটা 'বিদেশী ভূত' এসে দোর খুলে দিল। স্বামীর মতই বিদেশী পোশাক তার পরনে, মাথায় লাল রঙের অদ্ভুত টুপী। চোখ দুটি নুড়ির মত সাদা। ঠিক আমাদের উত্তর দিকের অধিষ্ঠাতা দেবতার মত।

আমি তো ভয়ই পেলাম। স্বামী সাহসী, হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। লোকটা কি ঝাঁকুনিই দিল! আমার সঙ্গে স্বামী পরিচয় করিয়ে দিলেন। লোকটা আবার হাত বাড়ালো; কিন্তু ছুঁতে সাহস হলো না। কী হাতরে বাবা! জানোয়ারের মত লম্বা-লম্বা লোমে ঢাকা। চীনে রীতিতে অভিবাদন করলাম। লোকটা আমাদের বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল।

ঠিক আমাদের বাড়ীর মতই। ছোট হল, তার আশে-পাশে ঘর। একটি ঘরে একটি মেয়েকে দেখলাম। সাদা গাউন পরনে, কোমরে একটা দড়ি না কি বাঁধা! চুলগুলো বেশ পালিশ করে আঁচড়ানো; তবে খুব হলদে, চুল বলেই বিশ্রী লাগে। পা-দুটো কুলোর মত ধ্যাবড়া।

আহা, এমন যার চেহারা, তার ছেলেমেয়ে না জানি কেমন দেখতে!

ওরা ভদ্র, কিন্তু আদব-কায়দার কিছুই জানে না। মেয়েটা এক হাত দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা আমার দিকেই আগে এগিয়ে দিল! স্বামীর আগে আমাকে চা দেয়া কেন বাপু! আবার পুরুষটা এল আমার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে! ওমা, কি ঘেন্না, কি লজ্জা!

অবিশ্যি যে-দেশের যে-রীত! ঠাট্টা করা উচিত নয়। কিন্তু স্বামী না বললেন, ওরা বারো বছর এদেশে আছে! এতদিন বসে একটু ভদ্রতা শেখে নি গা! না, না, তোমার ওপর কটাক্ষ করবো কেন বোন, তুমি তো আমাদেরই একজন।

স্বামী বিদেশী মেয়েটিকে তার সন্তানদের দেখাতে বললেন। আভাস দিলেন, আমি শীগগিরই সন্তানের জননী হতে চলেছি। মেয়েটি আমাকে দোতলায় নিয়ে গেল।

দোতলায় গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল! দেখলাম, রোদে ছেলেমেয়েরা খেলছে। চমৎকার তাদের স্বাস্থ্য! সাদা চুল—আচ্ছা তোমাদের সাদা চুল বড় হলে কালো হয় কেন? ওদের দুধের মত সাদা রঙ দেখে মনে হলো, জলে ওষুধ দিয়ে ওদের স্নান করান হয়। স্নানের ঘরে নিয়ে গিয়ে মেয়েটি সব দেখাল। তারপর কাপড়-চোপড় দেখলাম। নীচে পরবার জামা সব সাদা! সব চেয়ে ছোট খোকাটিরও আগাগোড়া

সাদা কাপড়ে মোড়া! বললাম, "ওর কি কেউ মারা গেছে নাকি!" মেয়েটি বিস্মিত হয়ে গেল। অপ্রতিভ হয়ে বললাম, "সাদা কাপড় পরেছে কিনা তাই!"

—"না, না, তা নয়," মেয়েটি হাসলো, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যই আমরা সাদা ব্যবহার করি।" তাইতো, বিছানার চাদর, মশারি সবই যে সাদা! বিদেশীদের সবই দেখছি আলাদা!

আরো আশ্চর্য হলাম, ওরা ছেলেমেয়ে বুকে নিয়ে আদর করে। কেন, ঝি-চাকরের কি মড়ক হয়েছে! আমাদের বনেদী ঘরে ওসব হবার জোটি নেই।

বাড়ী এসে স্বামীকে সব বললাম।

"ওদের কি একটা ঝি রাখবারও মুরোদ নেই?" "সন্তান পালন," স্বামী বললেন, "দাসীদের দিয়ে চলে না। তোমাকে নিজের হাতে সন্তান পালন করতে হবে।"

"আমি?"

"কেন নয়। নিশ্চয়ই।"

"তাহলে আর দু-বছরের মধ্যে সন্তান যাতে না হয় সেই প্রার্থনাই আমি করবো।"

"তাই কোরো। কিন্তু শিশুপালন মার কাজ, ঝি-চাকরের নয়, একথা মনে রেখো।"

হয়তো, ওঁর কথাই ঠিক।

পরদিন শ্রীমতী লিউ-ইর সঙ্গে দেখা করে বিদেশী পরিবারের কথা বললাম। আহা, ওর ছেলেমেয়েদের মত সুন্দর হয় যদি আমার সন্তান! অমনি সোনালী চুল, অমনি স্বাস্থ্য!

শ্রীমতী লিউ-ইকে জিজ্ঞেস করলাম: "পুরানো রীতি আপনি মানেন?"

"মানি, আবার মানিও না। পুরানো রীতির ভালোটুকু নিতে দোষ কি?"

শ্রীমতী লিউ-ই আর আমি ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারে গেলাম। দামী সিল্কের কয়েকটা জামা তৈরী করতে হবে খোকার জন্য। ভালো জিনিস কেনা যে কি কষ্ট বোন! দু গজ মখমল কিনবার পর যখন বুড়ো দোকানীকে সিল্কের নমুনা দেখাতে বললাম, বুড়ো খেঁকিয়ে উঠলো।

হেসে বললাম, "আমার জন্য নয় বুড়ো, আমার ছেলের জন্য।"

এবার সব চাইতে সেরা সিল্ক এনে দিয়ে বললো, "নাও মা, ম্যাজিস্টরের বৌয়ের জন্য এনেছিলাম। তা মেয়েদের অত ভালো সিল্কের দরকার কি?"

এই কাপড়ই আমি চেয়েছিলাম। স্তূপীকৃত কাপড়ের

ভিতর থেকে ওর ঔজ্জ্বল্য আমাকে মুগ্ধ করলো। দোকানীও বুঝতে পেরে চড়া দাম হাঁকলো। পছন্দ হয়েছে যখন, নেবই ; দামের কথা কে ভাবে? ভাবী সন্তানের মতই সিল্কের কাপড় সযত্নে বুকে জড়িয়ে বাড়ি ফিরলাম। দরজী ডাকাই নি। আমার খোকার জামা আমি ছাড়া আর কে করবে? ইস্ ছুঁতেও দেব না! আজ রাতেই তৈরী করবো। আমার খোকাকে বাঘের মুখ আঁকা জুতো পরাব, গলায় দুলিয়ে দেব শতনরী হার! কি চমৎকার-ই না মানাবে!

আজ আমার সন্তান গর্ভের ভিতর নড়ে উঠলো। কি আনন্দ! ঐ নড়ে ওঠা যেন আমার খোকার ভাষা!

কাপড় তৈরী হয়ে গেছে। সাটীনের টুপীর ওপর মূর্তি বুনেছি সোনার জরী দিয়ে। চন্দন কাঠের একটা বাক্স করালুম কাপড়-জামা রাখবার জন্য। খোকা যখন পোষাক পরবে, চন্দনের গন্ধ ওকে খুশি করে তুলবে। আর আমার কিছুই করবার নেই। আর তিন মাস বাকি। এই দীর্ঘ দিন খোকার স্বপ্ন দেখেই কাটাবো। দেবী কোয়াঙ্-ইন, দাও না দিনগুলোকে এক নিমেষে নিঃশেষ করে, খোকাকে আমার কোলে এনে দাও মা!

কদিনই বা তাকে কাছে রাখবো? ওযে স্বামীর বংশের বাতি, ওঁরা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এইতো কাল ঐ কথা জানিয়ে শ্বাশুড়ী চিঠিও লিখেছেন। শ্বশুর মশাই তো খুব কম কথা বলেন; তিনিও সেদিন আমাকে ডেকে আশীর্বাদ করে এই কথাই বললেন। তাঁর মনে এরই মধ্যে খোকার, তাঁর পৌত্রের জন্ম হয়েছে।

মন বিষিয়ে উঠলো। খোকা আমার নিজের নয়, সমস্ত পরিবারের!

উনি তো যখনই এবিষয়ে কথা উঠতো, উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। এক পাল অসভ্যের ভেতর ঝি-চাকরের পরিচর্যায় ছেলে তাঁর বেড়ে উঠবে, হবে বিলাসী আর অমানুষ—এই চিন্তা অহরহ তাঁকে পাগল করে তুলতো। একদিন তো তিনি বললেনই: "এর চেয়ে বন্ধ্যা হওয়াই ভাল ছিল।" দেবতারা পাছে রেগে যান, তাই কত সাধ্য-সাধনা করে না ওঁকে চুপ করালুম।

রীতিকে মানবো না, তা কি হতে পারে! আমার বুক শূন্য হয়ে গেলেও আমার ভাবী সন্তানকে পরিবারের জন্য উৎসর্গ করবো। সে হবে বংশের গৌরব।

স্বামী সেই থেকে আর এ সম্বন্ধে কোনো কথাই তোলেন নি। হয়তো, পিতৃকুলের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করবার জন্য সঙ্কল্প করছিলেন। আমিই বা, ওসব ভাববার অবসর পেলাম কই? খোকা আসছে, তারই আনন্দে আমার প্রাণ ভরে গেল।

বোন,

ভেতরে-ভেতরে তিনি যে কাণ্ড করে বসেছেন, কী করে জানবো বল। তিনি নাকি শ্বশুর মশাইকে গিয়ে বলেছেন, স্ত্রীর মত ছেলেও তাঁর নিজস্ব—বংশের কোনো দাবি-দাওয়া তার ওপরে নেই! একথা কি করে বললেন উনি!

ওঁর বাবা-মা শুনে খুবই রেগে গেলেন। আর রাগ হওয়ারও কথা বাপু। ছেলে কি না ঐ কথা বলে! উনি কিন্তু ভ্রূ-ক্ষেপও করলেন না। অবশেষে ওঁর বাবা কেঁদে ফেললেন। ছিঃ উনি বাবাকে কাঁদালেন! এই কি শিক্ষা! কিন্তু কি পাষাণ প্রাণ, একটু গললো না!

আমার কিন্তু ভালোই হলো। খোকাকে পরের হাতে বিলিয়ে দিতে হবে না, আমার খোকা আমারই থাকবে। উনি যে-দিন সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে আসেন, মনে মনে ওঁকে তিরস্কার করেছিলাম, আজ কিন্তু পূজো করতে ইচ্ছে হলো। মাতৃস্নেহ কি অন্ধ! খোকন, আমার সোনা খোকন তোমাকেত আমি চোখের আড়াল করবো না!

দেবতাদের অসংখ্য ধন্যবাদ! তাঁদের আশীর্বাদেই এমন উদার-চেতা স্বামী পেয়েছিলাম। তাই না খোকাকে একান্ত আপনার করে পাবো। স্বামীর কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

মাঠের দিকে রোজ চেয়ে দেখতাম, সবুজ ধানে নুয়ে পড়েছে গাছগুলি। সূর্যের যা তেজ, দু-একদিন পরেই সোনার রঙ্ দেখা দেবে। চাষীরা ধানকেটে নিয়ে যাবে। আনন্দের আভা তাঁদের মুখে চোখে ফুটে উঠবে। ···শুভ বর্ষেই খোকা আমার জন্ম গ্রহণ করবে।

আর কতোদিন কাটাবো এই স্বপ্ন নিয়ে? স্বামীর ভালোবাসার কথা ভুলেই গেছি। শুধু খোকার চিন্তা।

খোকা আগে জন্ম গ্রহণ করুক, স্বামীর বিষয় তারপর ভাববো।

বোন, দেখ, দেখ, খোকার কাণ্ড দেখ। শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে দেখো না। কি দুষ্টু ছেলে! এখুনি কান্না জুড়ে দেবে। কোলে নিলে তবে ঠাণ্ডা।

হাঁ—কি বলছিলুম? খোকা হওয়ার আগের কথা? রাতদিন খোকার স্বপ্নে বিভোর হয়েই কাটতো! বাইরে পাকা ধানের মঞ্জরী বিকেলের সোনালী আলোয় যখন ঝলমল করতো, তখন আমাকে যেন পরিপূর্ণ ভাবে তার ভিতর দেখতে পেতাম। পৃথিবী আর নারী! পৃথিবীর পরিপূর্ণতা ফলে ফুলে, আর নারীর—সন্তানে।

ব্যথা উঠ্‌তো। চুপ করে থাকতাম। এই ব্যথাইতো তার আগমনের ইঙ্গিত। তারপর একদিন খোকা ভূমিষ্ঠ হলো, আমার সোনার খোকা!

দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু দুর্বলতা আমাকে অভিভূত করতে পারে নি, এযে আমাদের জয়ের গৌরব। স্বামী দাই-য়ের কাছে খবর পেয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। কোনো-রকমে উঠে বসে খোকাকে তাঁর কোলে বসিয়ে বললাম "স্বামি, এই আপনার পত্নীর উপহার। তাকে গ্রহণ করে পত্নীকে কৃতার্থ করুন!"

কেমন নাটুকে কথা নয়? কিন্তু ঐ বলার নিয়ম যে! তিনি আমার চোখের দিকে চেয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কি দেখছিলেন।

তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন ঃ "এ-দান আমি গ্রহণ করে কৃতার্থ হলুম। কিন্তু পুত্রতো আমার একার নয়, তোমারও। তোমার হাতে আবার তাকে সঁপে ।"

বোন, কাঁদছো! আমিও কেঁদেছিলাম। অত আনন্দেও চোখে জল আসবে না! ওমা কি নিষ্ঠুর খোকা-টা! আমাদের চোখে জল দেখে হাসছে!

দ্বিতীয় পর্ব

বোন

এখন থেকে আর তোমার কাছে দুঃখের কাঁদুনি গাইব না। আমার আবার দুঃখ কি? স্বামীর মন পেয়েছি, খোকা, আমার সোনার খোকা কোলে এসেছে! দুঃখকে আর কাছে ঘেঁষতে দেব? কিন্তু দুঃখ নাকি ফুরোয় না বোন, কোন দিক দিয়ে অতর্কিতে সে আক্রমণ করে, দেবতারাই জানেনা, মানুষ কোন ছার।

না, না খোকার অসুখ নয়। ন' মাসে পড়েছে আমার খোকনমণি! কি একগুঁয়ে আর দুষ্টু! হাঁটতে শিখে আর একদণ্ড বসতে চায় না। ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। বসতে গেলে রাগ দেখে কে! উনিতো বলেন, আদর দিয়ে আমি ওকে নষ্ট করছি। কিন্তু কি করবো, অমন খোকাকে কি আর প্রাণ ধরে গাল দেয়া যায়! হাঁ, তারপর দুঃখের কথা বলছিলাম, না?

এবার দুঃখ দিল দাদা। তুমি তো জানোই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। কি ভালই না বাসতাম দাদাকে! তারপর অনেকদিন খবরই পাইনি। মার কাছে খবর জানতে চাইলে তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন. তাঁর নিষেধ না মেনে চলে গেছে, এ অপমান তিনি জীবনে ভুলতে পারবেন কিনা সন্দেহ!

মার নিষেধ অমান্য করেই দাদা ক্ষান্ত হয়নি সেদিন ওয়াঙ্‌ডা-মা মার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছিল। বুড়ী খোকাকে খুব আদর করল, তারপর চিঠিখানা দিল আমার হাতে। চোখে জল দেখলাম যেন!

তবে কি মা নেই। দেখে এসেছিলাম, তিনি খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। একটিবার শেষ দেখাও হোলো না! ওয়াঙ্‌-ডা-মাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, গো, না," সে বুড়ী উত্তর দিল, "সে মরলে তো চুকেই যেত! দেবতারা তাকে অখণ্ড পরমায়ু দিয়ে পাঠিয়েছেন!"

"বাবা?"

"তোমার বাবা ও নয়। চিঠিখানা আগে পড়েই দেখ মেয়ে।"

ওয়াঙ্‌-ডা-মার জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করে নির্জনে গিয়ে চিঠিখানা খুললাম, খুলতেই মার হাতের চিঠি পেলাম। কুশল প্রশ্নাদি করে অবশেষে মা লিখেছেন:

"তোমার দাদা কয়েক মাস হোল বিদেশে গেছে। আজ

তার চিঠি পেলাম, সে একটি বিদেশী মেয়েকে বিবাহ করতে চায়।”

আর কিছু লেখা নেই। তবু ঐ দু-ছত্র লেখায় যেন কত ব্যথা ফুটে উঠেছে। দাদাটা কি! ওকথা মাকে কি করে লিখলে? কুপুত্র!

চিৎকার করেই উঠেছিলাম বুঝি! ঝি দৌড়ে এসে বারণ করল; উত্তেজিত হোলে নাকি স্তনের দুধ বিষাক্ত হয়ে যায়। খোকার মুখ চেয়ে চুপ করলাম! ওয়াঙ্-ডা-মাকে বললাম, “আর একটু অপেক্ষা কর, উনি এলে তোমার সঙ্গে গিয়ে মাকে দেখে আসব।”

বুড়ী রাজি হলো।

স্বামীর ঘরে তাঁর আসার অপেক্ষায় বসে থেকে দাদার কথাই মনে পড়ছিল। বিদেশী পোশাকে যখন ওর প্রেমিকার সঙ্গে বেড়ায়; কেমন লাগে দেখতে? কি জানি, দাদার ছেলেবেলার চেহারার সঙ্গে তো এসব খাপ খায় না!

ছেলেবেলায় কি সুন্দরই না ছিল! উঠোনে যখন খেলা করত, উপপত্নীরা দেখে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরত। ওরা সাধারণ ঘরের মেয়ে, ওদের ছেলেমেয়েরা কি আর মার ছেলে মেয়ের মত হবে! মা কত বড় বনেদী বংশের মেয়ে। কই অমন রূপ তো আজও আমার চোখে পড়ল না।

হাঁ, দাদার কথাই বলছি বোন! দাদা ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ রাগী আর একগুঁয়ে। ঝি-চাকর থেকে সুরু করে মা পর্য্যন্ত ওর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতেন। না, না, দাদা অবাধ্য হলে তাকে ক্ষমা তিনি করতেন না। কিন্তু তাকে হুকুম করতে গিয়ে অনেক সময় সতর্ক হতে দেখেছি। একদিন দাদার খেতে বসবার আগে টেবিল থেকে চর্বিতে ভাজা পিঠে তুলে নিয়ে যেতে বললেন। দাদার তখন অসুখ; যদি খেতে চায়তো কোনো রকমেই তাকে বাধা দেয়া যাবে না।

দাদার দুর্দমনীয় ইচ্ছের কাছে সবাইকেই মাথা নোয়াতে হোত। একসঙ্গে মানুষ হয়েও এই আকাশপাতাল তফাৎ দেখে আমি বিস্মিত হই নি। সে বংশের গৌরব, তার আদর একটা মেয়ের চাইতে বেশি হবে বই কি! কত কর্তব্য তার!

দাদাকে তখন কত ভালই না বাসতাম! একদণ্ড তাকে না হলে আমার চলত না। বাগানে একসঙ্গে বেড়িয়েছি, পুকুরে সোনালী মাছের খেলা দেখেছি কতদিন! একবার কতগুলো সাদা নুড়ি কুড়িয়ে একটা ছোট্ট বাড়ি তৈরী করেছিলাম। ওর কাছেই আমার প্রথম অক্ষর পরিচয়। এক কথায় বলতে গেলে দাদার ছায়া হয়েছিলাম, বোন! তারপর ন' বছর বয়েসে হল ছাড়াছাড়ি।

প্রথম দিন খুব কেঁদেছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম : আমি আর দাদা পরীর রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি; সে রাজ্যে বিচ্ছেদ নেই, চিরমিলন।

আমাকে শুকিয়ে যেতে দেখে মা একদিন বললেনঃ "ভাইয়ের জন্য এত দরদ দেখাবার কোন প্রয়োজন নেই, কিউ-ই-লান। সময় আসছে, যখন স্বামী ও সন্তানের জন্য এর প্রয়োজন হবে। দাদাকে ভুলে যাও। লেখাপড়া শেখো, ছুঁচের কাজ শেখো। যা বাড়ন্ত গড়ন, বিয়ের বয়স তো হয়ে এলো!"

মা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, "ছেলে আর মেয়ের জীবন কখনও এক ভাবে চলতে পারে না। ছেলে বংশের গৌরব, পিতৃপুরুষ তার হাতের পিণ্ড পাবার জন্য প্রত্যাশী। মেয়ে বংশের কেউ নয়, যে-বংশের সে বাগদত্তা, সেই বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে তাকে। তার চাই উপযুক্ত শিক্ষা।" কি আর করব, বিয়ের পড়ায়ই মন দিলাম।

আর একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে! দাদা পিকিঙে পড়তে যাবে, মার অনুমতি নিতে অন্দরে এলো, আমিও সেখানে বসেছিলাম। দাদাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল ধূসর রঙের পোষাকে! মার কাছে এসে মাথা নুয়ে বললো "মা, পিকিঙে যাবার তুমি যদি অনুমতি দাও তো যেতে পারি।"

মা জানতেন, তাঁর অনুমতির অপেক্ষা রাখে নি দাদা। তবু কান্নাকাটি না করে বললেনঃ "তোমার বাবার মতেই আমার মত। আর স্ত্রীলোকের মতের কিই বা দাম! কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, বাড়ি ছাড়বার কি প্রয়োজন

ছিল? তোমার বাপ-ঠাকুর্দা এইখেনেই লেখাপড়া শিখেছেন। শহরে কত বিদ্বান রয়েছেন, তাঁদের কাছে তো শিখতে পারতে? তারপর তোমার জন্য টুয়েন থেকে টা-আঙকে আনানো হলো, তবুও তোমার বিদেশী শিক্ষার বাই গেল না। যাও, বাধা দেব না; কিন্তু মনে রেখো, আমাদের কাছে, বংশের কাছে এখনও তোমার কর্তব্য শেষ হয় নি। বিয়ে করে গেলে—”

দাদা বিয়ের নাম শুনে ক্ষেপে গেল। মা তাকে শান্ত করে বললেন, “বলেছি তো, আমার মতামতের কোনো দাম নেই। তবে, মা—এই হিসেবেই সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার জীবন তোমার একার নয়। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেল না।”

দাদা চলে গেল।

এই ঘটনার পর দাদাকে খুব কমই দেখেছি। আমার বিয়ের আগে মাত্র দু-বার বাড়ি এসেছিল। দু-দণ্ড কথা বলারও অবসর হয় নি। মার সঙ্গে দেখা করে সেই যে সদরে চলে যেত, আর আসতো সেই যাওয়ার দিন।

চেহারাও বিদেশে থেকে তার বদলে গিয়েছিল। ছেলেবেলার কোমলতাটুকু ছিল না। মা একদিন কারণ জিজ্ঞেস করতে বললে, স্কুলে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হয়। গোলগাল শরীর নাকি মেয়েদের জন্য! আমাদের তো বাপু কাঠখোট্টা চেহারা থেকে গোলগাল নধর গড়নই ভাল লাগে! দাদার

কী সুন্দর চেহারাই না ছিল! ওকে দেখে বাবার প্রথমা উপপত্নী একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, "ওর বাপ যখন অমনি সুন্দর ছিল, তাকে ভালোবেসেছিলাম!"

দাদা পিকিঙ থেকেই বিদেশে চলে গেল। তার কথা প্রায় ভুলেই গিছলাম। আজ চিঠিটা হাতে নিয়ে তার কথা মনে করতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, টুকরো-টাকরা ঘটনা ছাড়া কিছুই মনে নেই। দাদা আজ বিদেশীর মতই অপরিচিত।

স্বামী ফিরে আসতেই চিঠিখানা দেখালাম। চিঠি পড়ে বললেন, "মূর্খ, এমন কাজ সে কি করে করলো! তুমি গুছিয়ে নাও, তোমাকে মার কাছে যেতে হবে। দুঃখে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার আর কে আছে!"

খোকা আর খোকার ঝিকে নিয়ে রিক্সা করে মার ওখানে গেলাম।

বাড়িটা যেন থম্‌থম্ করছে। ঝি-চাকররা এখানে ওখানে ফিস্‌ফিস্ করছে। আমাকে দেখেই চুপ করলো। দ্বিতীয়া আর তৃতীয়া উপপত্নী দেখলাম, উইলোর ছায়ায় একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। এতদিন পরে দেখা, কোথায় কুশল প্রশ্ন করবে, তা না, "খোকাটি তো চমৎকার হয়েছে! দিব্যি মোটাসোটা।"

হতভাগীরা আমার খোকনের ওপর নজর দেয় কেন ?

তৃতীয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা কোথায় ?"

"ঘরেই আছেন। আজ তিন দিন ধরে চাল ডালের বারদ্দ দিতে একটি বারও বেরোন নি। কি গম্ভীর, আমাদের কথা, ব'লতেই সাহস হয় না! তুমি দেখা করে এসো, তোমার কাছেই শুনবো সব। ভাই, খোকাকে রেখে যাও না।"

"না", বললাম, "মাকে দেখাব। দেখি, দুঃখে একটু যদি সান্ত্বনা পান!"

মার ঘরের সমুখে এসে দেখলাম, দরজা বন্ধ। আস্তে টোকা দিলাম, উত্তর নেই। ডাকলাম, "মা দরজা খোল, আমি।" বহুদূর থেকে সাড়া এলো : "এসো মা, এস। ভেজানো আছে।"

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলাম। মা বসে বই পড়ছেন। দেয়ালে কণফ্যুসির বাণীর সমুখে ধূপ জ্বলছে। আমাকে দেখে বই মুড়ে রেখে বললেন, "এসেছ মা! ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ছিলাম, শান্তি পেলাম না।"

মাকে এত মুষড়ে পড়তে কখনো দেখি নি! মা চিরদিন সংযত; দুঃখের ঝড় তাঁর ওপর দিয়ে অনেক বয়ে গেছে। কিন্তু আজ একেবারে ভেঙে পড়েছেন। হবে না? আমার খোকন যদি···

মা খোকনকে তিন মাস বয়সে একবার দেখেছিলেন, নতুন করে আবার দেখলেন যেন। তা খোকাতো আমার নিতুই

নতুন! দেরাজ থেকে একটা লাল কেকের বাক্স বার করে ওর হাতে দিলেন। খোকা বাক্সটা বুকে আঁকড়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

মাও হাসলেন। আমার যাদু মণির হাসি দেখে কেউ না হেসে পারে!

"খাও", মা খোকনকে আদর করে বললেন, "খাও খোকন-মণি, আমাদের পদ্মের কলি খাও।"

আমি চা তৈরী করে মাকে এগিয়ে দিলাম।

তিনি খোকার খেলাই দেখছিলেন! ভাবলাম, এই অবসরে দাদার কথা তুলবো কিনা! তিনি সে প্রসঙ্গ না তুলে বললেন, "কি, ছেলে কোলে পেয়ে খুসি হ'য়েছ তো, মা! ছেলে নাকি হবে না!"

মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম।

"খুসী হয়েছ তো মা?" তখনও তিনি খোকাকে দেখছিলেন।

"উনি আমাকে খুব ভালোবাসেন।" গলার স্বর লজ্জায় বুজে আসছিল।

"খোকাটিতো তার পরিচয়," মা বললেন, "সুখী বাপ-মার এমন সুন্দর সন্তান হয়। তোমার দাদা, সেও এমনি সুন্দর ছিল। তখন যদি মরে যেত, আজ কাঁদতে পেতাম। কিন্তু সে তার উপায়ও রাখে নি, সে অবাধ্য!"

মা তাহলে দাদার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান! কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার চিঠি পেয়েছিলে?"

"হাঁ"—উত্তর দিলাম।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন যেন! তারপর টেবিলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "ওখানে চিঠি আছে, পড়।"

চিঠিখানা লিখছে দাদার বন্ধু চু দাদার অনুরোধে। বাঁধি গতের পর জানিয়েছে, দাদা আমেরিকায় তারই এক শিক্ষকের মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। বাপ-মার সম্মতি প্রার্থনীয়। আর লী-দের সম্বন্ধে যেন ভেঙে ফেলা হয়। সময় বদলে গেছে। চীন দেশের রীতি অনুসারে সে বিয়ে করতে নারাজ। বাবা-মা তাকে অযোগ্য পুত্র মনে করতে পারেন; কিন্তু পুরোনো বাক্‌দান পদ্ধতিতে সে বিশ্বাস করে না, কোনো অধুনিক মানুষই তা করতে পারে না।

শত কোটি প্রণাম এবং শত মার্জনা জুড়ে দিয়ে বন্ধুকে দিয়ে দাদা এই চিঠি খানা লিখিয়েছে। চিঠি পড়তে-পড়তে দাদার বিরুদ্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠছিলাম। পড়া শেষ হলে মার হাতে চিঠিখানা দিয়ে চুপ করে রইলাম।

মা বললেন, "শক্ত পাগলামীতে পেয়েছে! তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্য বিজলী-চিঠি পাঠিয়েছি।"

মা যে কত অধীর হয়ে পড়েছেন, তার পাঠানোর কথা শুনে বুঝতে পারলাম। যখন সহরে টেলিগ্রাফের তার বসলো, একদিন মাকে বলতে শুনেছিলাম, "আমাদের পূর্বপুরুষরা কলম আর হরফের আবিষ্কার করেছিলেন, আজ আমরা তার অপমান করতে বসেছি।"

বহুদূরদেশে খবর পাঠানো যায় শুনে জ্বলে উঠেছিলেন—"দূর দেশ? অসভ্যদের দেশে খবর পাঠিয়ে কি হবে? দেবতারা আমাদের সভ্যতাকে সমুদ্র দিয়ে ঘিরে ওদের বর্বরতার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন; আমরা আজ দেবতার ওপর নিজেদের বুদ্ধিকে বড় বলে মনে করছি।"

আজ কত অসহায় হয়েই না তাঁকে বিদেশী যন্ত্রের সাহায্য নিতে হলো! বললেন, "ভেবেছিলাম, নেব না বিদেশী কলের সাহায্য, মরুক সে বিদেশে! কিন্তু আবার ভাবলাম, সয়তানের পেছনে সয়তানকে লেলিয়ে দেয়া অধর্ম নয়।"

মাকে সান্ত্বনা দিলাম, "মা দাদা তো অবুঝ নয়। নিশ্চয়ই বিদেশী পেত্নীটাকে ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরবে।"

"ছেলে মানুষ কিনা," মা বললেন, "তাই ওকথা ব'লছো। তা হয় না। যখনই কোনো মেয়ে পুরুষের হৃদয় জয় করে, পুরুষ নিজেকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। তোমার বাবা তো একজন জ্ঞানী, তিনিও রূপমুগ্ধ হ'লে যুক্তিতর্ক মানতে চান না। বাড়িতে তিনটি উপপত্নী ছাড়া আরো যে কত নাচওয়ালীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে! পিকিঙের নাচওয়ালী তো আসছিলেন লা-মের জায়গায়। বোধ হয়, তোমার বাবার খেয়াল মিটেছে, তাই এলো না। বাপ যখন এমনি ধারা, ছেলের কাছ থেকে আর কত আশা করা যায়?"

"পুরুষ!" ঘৃণায় তাঁর ঠোঁট কুচকে গেল, "জীবন্ত নারীর গায়ে সাপের মত লেপটে থাকাই তার স্বভাব।"

বাবা ও তাঁর উপপত্নীদের বিরুদ্ধে এমন কথা মার মুখ থেকে কোনোদিন আর শুনি নি। তাঁর বুকের জ্বালা সঞ্চিত বিদ্বেষকে টেনে বার করছে। সান্ত্বনার ভাষা কোথায়? আমার স্বামী যদি···না ভাবতে পারলাম না। তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার কথা মনে পড়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, খোকা খেলা করছে। ছিঃ, কি ছোটই হয়ে যাচ্ছি! এমনি অলক্ষুণে সন্দেহ মনেও আসে!

মাকে বললাম, "বিদেশী মেয়েটি হয়তো"—মা নলে তামাক ভরতে-ভরতে বাধা দিয়ে বললেন, "তার সম্বন্ধে কিছুই বলবো না। ছেলেকে আসতে লিখেছি, ফিরে এসে লীর মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘর-কন্না করুক, বংশের গৌরব রক্ষা হোক। তারপর রক্ষিতা হিসেবে থাকে রাখুক না! বাপের বেটা তো, কত আর ভাল হবে! যাও, আমি এখন ঘুমোব।"

মার শরীর জীর্ণ হয়ে এসেছে! পাতের মত লেগে আছেন বিছানায়! না, বিরক্ত করে দরকার নেই। খোকাকে কোলে করে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ি এসে স্বামীকে বলতে বলতে কেঁদে ফেললাম। উনি হাতের ওপর হাত রেখে বললেন, "ছিঃ কেঁদো না! দাদা ফিরে আসবে।"

ক্ষীণ আশা হলো। কিন্তু পরদিন স্বামী যখন কাজে বেরিয়ে গেলেন, নিঃসঙ্গ বাড়িতে বসে আবার কাঁদলাম।

'মার কথাই ভুলতে পাচ্ছিলাম না। কতো আশা করে, কতো দুঃখ কষ্ট সয়ে তিনি দাদাকে পালন করেছিলেন। বুড়ো বয়সে সেই তাঁকে কাঁদাল! ভগবান করুন, দাদা ফিরুক! ঝগড়া করবো। কেমন করে সে বিদেশী পেত্নীকে বিয়ে করবে, তার ছেলেকে মার কোলে বসাবে?

দাদা ফিরুক! ঝগড়ার জন্য কোমর বেঁধেই আছি।

বোন,

কোন খবর নেই! পনেরো দিন ধরে মালীকে পাঠাচ্ছি মার ওখানে। রোজ এসে বলছে, মা বললেন, তাঁর কোনো অসুখ হয় নি। চাকররা বলেছে, তিনি ঘর থেকে বেরোন নি' কদিন! দাদারও কোনো খবর নেই।

নিজের হাতে তৈরী করে খাবার পাঠাই রোজ। চাকর এসে বলে উনি খেয়েছেন। তবে এখনও নাকি কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না। দাদার কথাই ভাবেন বোধ হয়। দাদাটা কি নির্লজ্জ! কর্তব্য ভুলে গেছে। মাকে মেরেই ফেলবে নাকি।

ভেবে-ভেবে ঠিকই করতে পারলাম না, দাদার মতলবখানা কি? মার প্রতি কর্তব্য নেই! এত বড়টা হলেন কার দৌলতে? ছেলেবেলায় না কণফ্যুসির বাণী শিখেছিলো: মানুষের প্রথম কর্তব্য বাপ-মার আদেশ পালন। বিদেশী আবহাওয়ায় সব ভুলে গেছে! বাবাও শীগ্‌গিরই ফিরছেন,

নিশ্চয়ই তিনি ওকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করবেন। আর ভেবেই বা কি করবো, মেয়ে মানুষের তো কিছু করবার উপায় নেই!

কদিনই বা চুপ করে থাকা যায়! আবার অস্থির হয়ে উঠলাম।

সেদিন রাতে খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝি-চাকর কাজ সেরে চলে গেছে। চারদিক নিরালা, নিঝুম। স্বামীর পাশে দালানে বসেছিলাম। চাঁদ উঠেছে আকাশে, মিঠে বাতাস বইছে। সাদা মেঘের মিছিল একঝাঁক বরফে মোড়া সাদা পাখীর মত মাঝে মাঝে চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে! বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট। এমন রাতে কার না মন খুসিতে ভরে ওঠে! স্বামী আমার হঠাৎ-খুসি লক্ষ্য করে বললেন, "চমৎকার রাত! বীণাটা এনে একটু বাজাও না।"

ভর্ৎসনার ছলে বললাম, "বীণা আর গানের তো এ রাত না। শাস্ত্রকাররা বলেন: "বীণায় ঝঙ্কার তুলতে হলে চাই শান্ত, প্রফুল্ল মন; চাই একজন রসবোদ্ধা।"

"আজ তো আর আমাকে অরসিক তুমি বলতে পার না। কিউ-ই-লান," তিনি বললেন, "বাজাও, বীণা বাজাও লক্ষ্মীটি!"

বীণা নিয়ে এলাম। কী গান গাইব? অনেক ভেবে গাইলাম:—

কন্‌কনে হৈমন্তী-হাওয়া,
বিশীর্ণ, অনুজ্জ্বল চাঁদ আকাশে।

ঝরা পাতার মর্মর শুনি।
তুষার তাড়িত কালো কাকটা
জীর্ণ পাতার আড়ালে আশ্রয় খোঁজে,
মেলে না তো,—তাই ওর বুকে উদ্বেলিত নিরাশা।
প্রিয়, এমন রাতে তুমি কোথায় ?
মন্দিরে বিরহিনী—রাতের তিমির
পুঞ্জীভূত তার বুকে। তুমি
কোথায় ?

গান থেমে গেল। রক্তাক্ত একটা পাখীর মত গানের শেষ কলি নিরাশার দীর্ঘ রেশ নিয়ে যেন মাথা খুঁড়ে মরছিল। একা! একা!—অণুরণিত হয়ে উঠলো আকাশে বাতাসে। সৌন্দর্য বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। এক অনির্বচনীয় দুঃখ ঘনিয়ে এলো মনে। চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। উনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "এত দুঃখ কেন, আমাকে বলবে কি ?"

এলিয়ে পড়লাম তাঁর কোলে, "মার ব্যথা বীণায় ধরা দিয়েছে। দাদা কি ফিরবে না ?"

স্বামী উত্তর দিলেন না। একটা চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, "সত্যি কথা শোনাই ভাল, সে ফিরবে না।"

"আপনি কেন অমন মন্দ ভাবছেন।"—ভীত হলাম।

"না ভাববার কারণ কি, বল ?"

"আমি জানি না।"—কেঁদে ফেললাম।

"কর্তব্যের ওজর আগের দিনে চলত, আজ অচল—" উনি বললেন। "যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পার, বিদেশিনীকে বিবাহ করবার নিষেধ কেন ?

বললাম, "বিদেশী পেত্নীকে বিয়ে করবার যুক্তিই বা কি ?" স্বামীর কাছে বলতে ভয় হলো, খোকা হওয়ার আগে দেখে এসেছি তো! সাদা চোখো পেত্নী সব! দাদাটা বাবার ছেলে হয়ে কিনা সৌন্দর্যবোধ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে!

স্বামী হেসে বললেন, "বিদেশীদের নাম করতে গেলেই তুমি ভূত আর পেত্নী ব্যবহার কর। সব চীনে যেমন স্থন্দর নয়, সব বিদেশী তেমনি কুৎসিত নয়। তোমার দাদার বাগদত্তা স্ত্রী লীর মেয়ে তো শুনেছি কদাকার! বাজারে দোকানে লোকেরা তো বলাবলি করে!"

"তাদের কি স্পর্দ্ধা!" চীৎকার করে উঠলাম, "একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সম্বন্ধে সমালোচনা করতে সাহসী হয়!"

"যা শুনেছি", স্বামী বললেন, "তাই বললাম। হয়তো এ সব শুনেই তোমার দাদার মন বিগড়ে গিছলো।"

চুপ করে থেকে আবার তিনি বললেন, "পাশ্চাত্যে এমন মেয়ে দেখেছি, যারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই সুন্দর, শান্ত!"

চোখ ঠেলে কপালে উঠলো! স্বামীর মুখেও ঐ কথা!

স্বামী বলে চললেন, "সূর্য আর বাতাসের মতই তারা মুক্ত, উদার! কি সুন্দর তাদের হাত! গহনার ভারে চীনে

মেয়েদের মত ভারী করে রাখে নি। নাচতে-নাচতে তারা চলে, হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পুরুষের মন কেড়ে নেয়, আবার ভুলতেও পারে অতি সহজে।"

কার কথা বলছেন অমন উচ্ছ্বসিত হয়ে? রাগে দুঃখে বললাম, "আপনিও?"

মৃদু হেসে বললেন, "পাগল! আমার হৃদয় তুমি ছাড়া কে জয় করবে?"

"বাবাঃ! যা পাথরের মত কঠিন।"—আঘাত করলাম।

"হাঁ", তিনি হাসলেন। "চীনেরা সবাই তাই। আমাদের মেয়েরা তো ভীরু, স্বল্পভাষী। তাই বিদেশী মেয়েদের দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। তোমার দাদা তাদের দেখে মুগ্ধ হবে, আশ্চর্য কি?"

জন্মগত সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো! বললাম, "দেবতার দোহাই, ওদের অসভ্যতার পরিচয় আর দেবেন না! ওদের জাতটাই কি অমনি?"

"না", স্বামী বললেন, "এ অসভ্যতা নয়, এ বলিষ্ঠ তরুণ মনের পরিচয়। তোমার দাদাও তরুণ, তাই বলছি। কিন্তু লীর মেজো মেয়ের পুরু ঠোঁটের উপায় কি হবে?"

স্বামী জ্ঞানী। এখন তো বুঝতে পারি বোন, তোমাদের নাচে গানে, পোষাকে একটা নেশা আছে। তখন কিন্তু মনে পড়ছিল, বাবার পাশে দাঁড়িয়ে লা-মের অশ্লীল হাসি!

সেদিন আর বীণা বাজানো হলো না। আকাশে চাঁদ-তারার দল মেঘে ঢেকে গেল। বৃষ্টির ছাঁট লাগছিল গায়। বদলে গেল রাতের রূপ। স্বামী আর আমি ঘরে চলে এলাম। কিন্তু ঘুমুতে পারলাম না সে রাতে।

ভোর হলো, আকাশের রঙ ফেরে নি ; বাতাস ভিজে। খোকা কাঁদছিল। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম। না, জ্বর হয় নি।

মালী ভোরে খবর নিয়ে এলো, বাবা ফিরেছেন। দু-দিন থাকবেন, শুনলাম।

খোকনকে লাল পোষাক পরিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চললাম। গিয়ে দেখি, বাবা পুকুর পাড়ে বসে লাল মাছের খেলা দেখছেন। গরম দিন ; গায়ে তাই ফতুয়া, পরনে সিল্কের পায়জামা। দ্বিতীয়া উপপত্নী পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছে। তার ছেলে বাবার কোলে হাঁটুর উপর বসে। আমাকে দেখেই বললেন, "এই যে, আমার ছোট মা তার ছেলে নিয়ে হাজির।"

হাঁটু থেকে দ্বিতীয়া উপপত্নীর ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে খোকনকে তুলে নিয়ে আনন্দে বললেন, "নাতি, আমার নাতি! ওরে মিষ্টি নিয়ে আয়—চিনির রসে ভিজানো খেজুর আর চর্বির পিঠে।"

ভয় পেয়ে বললাম, "বাবা, খোকন নরম জিনিস ছাড়া খায় না।"

বাবা ইসারায় চুপ করতে বলে খোকাকে আদর করতে লাগলেন “ছোট্ট মানুষটি, তোমার মা-টা বড্ড ভীতু! নরম জিনিস খাইয়ে রেখেছে ? বোকাটা জানে না, আমারও তোমার মত অনেক ছেলে আছে।’ আমার দিকে চেয়ে বললেন, “মা তোমার দাদা যদি এমনি একটি ছেলে আমাকে দিত !”

দাদার কথা উঠতেই সাহস করে বললাম, “দাদা বিদেশী বিয়ে করবে শুনে মা মুষড়ে পড়েছেন।”

“না”, বাবা বললেন, “তা হবেনা ! আমার অনুমতি ছাড়া সে বিয়ে করতে পারবে না। চব্বিশ বছর বয়সে রক্ত অমন একটু-আধটু চঞ্চল হয়ই। ও কিছু নয়। ওর মত বয়সে তিন-তিনটে নাচওয়ালীকে ভালোবেসেছিলাম। তা’ স্ফূর্ত্তি করুক, দু-চার মাসেই হাঁপিয়ে উঠবে। বিদেশে গিয়ে সন্ন্যাসী হতে হবে, তার কোনো মানে নেই।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, “তোমার মা এত বুদ্ধিমতী, টাকা কড়ির হিসেব রাখেন, সংসার চালান ; কোনোদিন আমার দোষ খোঁজেন নি। আজকাল দেখেছ, কেমন যেন হ’য়ে গেছেন। কেবল বলছেন, ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে।”

বাবা খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন, তারপর খোকার মুখে একটুকরো কেক গুঁজে দিয়ে বললেন, “খাওতো যাদু আমার।” আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ “কেন যে তোমার মা কেঁদে

কেটে অনর্থ কর্চ্ছেন, বুঝতে পারি না! আমার আদেশের অবাধ্য হবে, এমন ছেলে তোমার দাদা নয়।”

সন্তুষ্ট হ'লাম না কিন্তু। বললাম, “যদি বাগদত্তাকে বিয়ে করতে রাজি না হয়?”

. বাবা মৃদু হেসে বললেন ঃ “পাগলী! তাও কি কখনও হয়? এক বছর পরে লীর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেব। দেখবে, বছর ঘুরতেই ছেলে হয়েছে।” খুসী হ'য়ে খোকার গাল টিপে দিলেন।

স্বামীকে বাবার কথা বললাম। তিনি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, “ওরা রক্ষিতা হতে চাইবে না। ওদের দেশে এরীতি প্রচলিত নয়।”

দাদাকে পেয়েছে এইতো যথেষ্ট, রীতি মানবেনা? সে কি আশা করে, দাদার একমাত্র স্ত্রী হ'য়ে সংসার করবে? মনে মনে চটলাম। মা যা বাবার কাছে আশা করেন নি, চাইলেও পেতেন কিনা সন্দেহ, বিদেশী পেত্নীটা তাই চাইবে!

বললাম, “না, এ বিয়ে অসম্ভব। বিদেশী হাওয়ায় আমাদের পবিত্র বংশকে অপবিত্র করতে সে পারবে না!”

আচ্ছা, স্বামী বললেন, “আমি যদি বলি একটি উপপত্নী রাখবো, তুমি খুসি হবে?”

ভয়ে বুকখানা হিম হয়ে গেল। কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম ঃ "না, না। আমিতো আমার কর্তব্য করেছি। আমার অপরাধ ?"

আমাকে আদর করে বললেন, "ভয় পেওনা, কিউ-ই-লান, চীনের বর্বর রীতি আমি মানি না।"

আশ্বস্ত হলাম। অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে একথা পুরোনো হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তা শুনি নি। স্বামী আমাকে ভালবাসেন যে! আজ তিনি আমাকে আঘাত করলেন। স্বামী-বঞ্চিতা নারীরা স্বামীকে ভালোবেসে চিরদিনই এমনি আঘাত পেয়েছে। কাঁদলাম।

"কাঁদছ কেন ?"—জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা নিচু করে রইলাম। মুখখানা দু-হাতে তুলে ধরে আবার প্রশ্ন করলেন ঃ "বল, কাঁদছ কেন ?"

সত্যি কথাই বললাম, "আপনি আমার স্বামী, আপনার ভালোবাসা যখন হারিয়েছি, আমার কি উপায় হবে ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ "সেই বিদেশী মেয়েটি, সেও যদি তোমার দাদাকে ঠিক তোমার মত ভালোবেসে থাকে ? সাগর পারে জন্মেছে বলে তার স্বভাব তো বদলায় নি। সে নারী। তোমার মতই তার কামনা, তার ভালোবাসা।"

এমন করে কখনও ভাবতে শিখি নি তো ? স্বামী, গুরু আমার! আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। মেয়েটি যদি আমার মতই দাদাকে ভালোবাসে, কী উপায় হবে ?

দাদার কাছ থেকে চিঠি এলো। স্বামী আর আমার সাহায্য চেয়ে লিখেছে, আমরা যাতে বাবা-মাকে বুঝিয়ে রাজি করাতে পারি। তারপর করেছে, বিদেশী প্রেমিকার রূপ-বর্ণনা। কি জোরালো ভাষা, প্রতিটি কথা যেন বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরী! একটি উপমা মনে পড়ছে: তার প্রেমিকা যেন বরফ-ঢাকা পাইনের মত দেখতে।

বিদেশী প্রথায় তাদের বিয়ে হয়ে গেছে, সে খবরও জানিয়েছে। মার চিঠি পেলেই বিদেশী বৌ নিয়ে দেশে ফিরবে। আমরা যেন তাদের প্রেমের পথকে সুগম করে দেবার চেষ্টা করি।

প্রেম! তার মর্ম তো ভালো করে বুঝতে পেরেছি। দুঃসাধ্য হলেও দাদার অনুরোধ রাখতে চেষ্টা করবো।

আগে তো মার কাছে যাই।

তিন দিন হলো মার কাছে গিয়েছিলাম, বোন। দাদার হয়ে অনেক কথাই তো বললাম। বুঝতে পারলেন বলে মনে

হলো না, বরং রাগই করলেন বুঝি! বললামঃ তাঁর নিজের বিয়ের কথা, বাবার ভালোবাসা—এসব স্মরণ করে যদি তিনি ক্ষমা করেন দাদাকে।

কিন্তু প্রেমকে ভাষার গণ্ডীতে বন্দী করা যায় কখনো? কে কবে শুনেছে সোনালী মেঘ লোহার পাত্রে ধরা দিয়েছে। এ-যেন প্রজাপতিকে বাঁশের তুলি দিয়ে আঁকা হয়েছে। তবু যাহোক করে জোড়া-তালি দিয়ে প্রেমের মহিমা কীর্তন করলামঃ প্রেম বন্ধন মানে না, রীতিনীতি মানে না। দাদাও বিদেশিনী সেই প্রেমের কাছেই পাঠ নিয়েছে। ইস্, লজ্জায় ঘেমে উঠছিলাম! মার কাছে কখনও ওসব কথা বলা যায়?

মা কিন্তু আমার নজীর উড়িয়ে দিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেনঃ "স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের ভিতর কবিত্ব নেই, আছে কামনা। পুরুষ চায় স্ত্রীর সংসর্গ, স্ত্রী চায় সন্তান। দু-পক্ষের কামনা পূর্ণ হলেই সবশেষ হয়ে গেল।"

ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালামঃ "আপনার বিয়ের দিন স্মরণ করুন। মন কি আনন্দে নেচে ওঠে নি?"

আমার ঠোঁটে আঙুলের আঘাত করে বললেনঃ "চুপ। ওঁর কথা তুলো না। হাজারটা মেয়ে ওঁর মনে বাসা বেঁধেছিল। একজনের প্রেম নিয়ে কি করবেন?"

তাঁর হাতখানার ওপর আলতো একটু চাপ দিয়ে বললামঃ "কিন্তু আপনার মনে?"

"না, এ-বুক শূন্য। প্রেম ছিল না, ছিল সন্তানের কামনা। সে কামনা আজো আছে। তোমার দাদার ছেলে যেদিন পিতৃপুরুষের স্মৃতি-মন্দিরে প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করবে—সেইদিন হবে তার নিবৃত্তি।"

আর কিছু বললেন না। অনেকক্ষণ বসে থেকে ফিরে আসতে হলো।

মার কাছ থেকে কতদূরে চলে গেছি, তাই ভাবি। আমূল পরিবর্তন হয়েছে আমার, আর এ পরিবর্তন ঘটিয়েছে প্রেম।

সেতুর মতো বর্তমান আর অতীতের মাঝখানে দুলছিলাম। মা, মূর্তিমতী অতীত—তাঁকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে দেখি, স্বামী হাত বাড়িয়ে আছেন। তিনি মূর্তিমান বর্তমান। স্বামীকে তো আর অপমান করতে পারি না?

ভবিষ্যৎ কি হবে কে জানে!

দিনগুলি একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেদিন স্বপ্ন দেখলাম, নীল সাগর, আর তার বুকে সাদা জাহাজ পাখীর মত উড়তে-উড়তে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। যদি পারতাম, হাত বাড়িয়ে তার গতিরোধ করতাম! দাদার সুখী হওয়ার কোনো আশাই নেই। বাপের ভিটায় তো ঠাঁই হবে না।

কি অশান্তি বোন, শুধু খোকনের মুখ দেখলে সব ভুলে যাই। তাইতো খোকাকে আজকাল আর চোখের আড়াল

করি না। কিন্তু রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কানে বাজে সমুদ্রের গর্জন। জাহাজ এগোচ্ছে, কি করে তার গতি রুধবো ?

বোন, দাদা বৌ নিয়ে এলে কি উপায় হবে ? দাদার অপেক্ষায়ই দিন কাটছে।

স্বামী বললেন কাল, আর সাতদিন পরে জাহাজ সহরের উত্তর দিকে সমুদ্রের মোহানায় ভিড়বে। স্বামী তো আর জানেন না, এই অষ্টম দিনটাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য আমার মন কত ব্যাকুল !

তিনি পুরুষ, তিনি কি আর মার দুঃখ বুঝবেন ? আমিও তো আর মার কাছে যাই নি। দেখা করবার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। শুধু ভুলতে পারি না, মা একা, বড় একা !

দাদা আর তার বিদেশী বৌয়ের কথাও কি ছাই ভুলতে পারি !

বোন,

তোমার ছুটি কখন হবে, তার জন্যে বসে থাকতে পারবো না! পায়দলে এসেছি। ঝির কোলে খোকনকে যখন রেখে আসি, কি চিৎকারই করছিল! না, না, চা থাক। আমাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে।

শুধু খবর দিতে এলাম, তারা এসেছে—আমার দাদা আর তার বৌ, এইতো দু-ঘণ্টা আগে এসে পৌঁছেছে। আমাদের ওখানেই উঠেছে। খেতে বসে তড়বড় করে কত কথা বলে গেল, বুঝতে পারলাম না। কি চেহারা, কি পোশাক সবই অদ্ভুত!

সবে ছোট হাজিরীতে বসেছি, এমনি সময় তারা এলো। দরোয়ান খবর দিল: এক ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গীটি মেয়ে না পুরুষ বোঝা যায় না;—লম্বা পুরুষের মতো, মুখখানি মেয়েলি।

স্বামী ভাতের কাঠি ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই তারা এসেছে।"

তিনি দৌড়ে গিয়ে ওদের নিয়ে এলেন।

অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে গেলাম; কিন্তু মেয়েটির

লম্বা চেহারা দেখে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। দাদার সঙ্গে কথা বলবো কি? দেখছিলাম তার বৌকে—কী লম্বা, দেহখানা লতার মতো ক্ষীণ; পরনে ঘন নীল পোশাক!

উনি কিন্তু অবাক হন নি। ওদের বসতে বলে চা আর ভাত আনতে হুকুম দিলেন। আমি কি বলবো? বৌকে দেখছি।

মনে মনে প্রশ্ন করলাম, আমাদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে?

মনে হলো, সে যেন স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যে—স্বপ্নেও যাকে ক্ষণস্থায়ী বলে মনে হয়।

কেমন দেখতে, জানতে চাইছ বোন? কি জানি, এসেছে পর্যন্ত একবারও ওর মুখ থেকে চোখ ফেরাই নি, তবু যেন ছাই কথা খুঁজে পাচ্ছি না! মনে করতে দাও, কেমন দেখতে?

হাঁ, হয়েছে! দাদার চাইতে একটু লম্বাই হবে। চুল কানের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ে নি; ছোট করে ছাঁটা, উড়ন্ত; চোখ দুটি খুব বড়। মুখে হাসি নেই।

এই কি সুন্দর নাকি! কি পছন্দ দাদার! ভ্রূ দুটো কি ধ্যাবড়া! দাদাকে ওর পাশে কি ছোটোই লাগে!

দু-জনের মুখ ঢেকে ওদের হাত ক'খানা যদি পাশাপাশি রাখা যায়, দাদার হাত দু'খানাই মেয়েদের মতো ছোটো আর নরম মনে হবে। বৌ আমার হাত ধরতে কি কর্কশই মনে হলো তার হাত! দাদাকে আড়ালে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

ওর হাত অমন শক্ত কেন? দাদা হেসে বললো, "টেনিস খেলে হাতে কড়া পড়ে গেছে।" ওমা, হাতে কড়া পড়েছে খেলে! সবই অদ্ভুত বিদেশীদের! পা দু'খানিও দাদার চেয়ে ইঞ্চি দু'য়েক বড়ই হবে। কি লজ্জার কথা!

দাদাকে বিদেশী পোশাকে পর-পর লাগছিল। যৌবনের সৌন্দর্য এক ফোঁটাও নেই! কেমন রুক্ষ ভাব। আঙুলে একটা আঙটি দেখলাম, তাও সাধারণ, পাথর বসানোও নয়।

বসবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত বিদেশী। পায়ের ওপর পা তুলে স্বামী আর তার বৌয়ের সঙ্গে বিদেশী ভাষায় কি বলছিল! কে বলবে কোনো বিদেশী নয়, আমার দাদা।

নাক, চোখ, মুখও বদলে গেছে। শুধু বাঁকা ঠোঁটে এখনও সেই ছেলেমানুষী ভাব। ওই দেখেই বোঝা যায়, ও আমার দাদা।

বাড়িতে দেখছি, সবাই বিদেশী—শুধু আমি আর খোকা ছাড়া!

মা ওদের ঘরে নেয়া পর্যন্ত আমাদের এখানেই থাকবেন শুনলাম। একথা শুনলে মা চটে যাবেন না? কি করবো, স্বামীর হুকুম!

খেতে বসে বড় হাসি পেল। দাদার বৌ খোকার মতো করেও ভাতের কাঠি ধরতে পারে না! ওর স্বর কি মোটা!

মেয়েদের স্বর হবে কত মৃদু—যেন ছোট্ট পাখী শরবনের ভিতর গান গাইছে। এ যেন পাকা ধানের ক্ষেতে থ্রাস পাখীর কর্কশ ডাক। স্বামী আর দাদার সঙ্গেই কথা বলছিল। আমি তো ও পোড়া কথা বুঝি না। আমার পানে তাকিয়ে হাসলো। ও আমার বন্ধুত্ব চায় নাকি? মনে মনে বললাম, খোকনকে নিয়ে আসি, দেখি সই পাতাতে কত দেরী হয়?

খোকনকে লাল জামা, সবুজ পায়জামা, চেরী-আঁকা জুতো, টুপী পরিয়ে নিয়ে এলাম। গলায় দুলছিল রূপোর হার। ঠিক যেন রাজপুত্তুরটি!

নমস্কার করতে বললাম, খোকা খুদে খুদে হাত দু-খানি জোড়া করলো।

আনন্দে বৌ যেন ফেঁপে উঠলো! তারপর খোকাকে বুকে আঁকড়ে ধরে চুমোয়-চুমোয় মুখ চোখ ভরে দিল।

দাদার বিদেশী বৌ তো এমনি একটি সন্তান চায়! হেসে বললাম, "আজ থেকে আমরা সই।"

দাদা কেন যে ওকে ভালোবাসে, এবার বুঝতে পারলাম।

পাঁচ দিন কেটে গেছে। এখনো তারা মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে নি। দাদা আর উনি তো সারাদিন এই নিয়েই

আলোচনা করেন। জানি না. কি ঠিক করছেন! আমি কিন্তু এদিকে বৌকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি।

আমাদের মেয়েদের মত নয় বৌ। চঞ্চল, লাজলজ্জার বালাই নেই। দাদার দিকে চেয়ে থাকে! পুরুষদের কথা হাঁ করে শোনে, দরকার হলে বলেও। ঠিক লা-মে যেন!

লা-মের তবু ভয় বলে একটা পদার্থ ছিল, এর তাও নেই। তাই বলে লা-মের মত সুন্দরী নয়। সৌন্দর্য সে চায় না! নিজের পরিপূর্ণতায় উপছে পড়ছে। তার চোখ দুটি যেন বলছে: আমার স্বরূপ দেখ। সাজ-পোশাকে তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চাই না। সারাদিন বই পড়ছে, খোকনকে আদর করছে আর চিঠি লিখছে। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সবাই গম্ভীর, ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই! দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে; বাগানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে! বুনতে তো একটিবার দেখলাম না। বিদেশীদের ধরনই আলাদা!

এক দিন দাদা আর বৌ সকালে বেরিয়ে গেল, ফিরলো সেই দুপুরে। ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওরা কোথায় গিয়েছিলো? খাওয়া নেই, দাওয়া নেই!"

"হাইকিঙে বেরিয়েছিল।"—স্বামী বললেন।

"সে আবার কি?" আশ্চর্য হয়ে শুধোলাম।

"দূর জায়গায় হেঁটে যাওয়াকে ওরা 'হাইক' বলে। আজ ওরা ঐ লাল পাহাড়ের ওপর উঠেছিল।"

"কেন?"

—"ঐতো ওদের আনন্দ।"

এখানকার নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাও হেঁটে যেতে চায় না! দাদাকে একথা বলায় বললো, "এখানে এই ছোটো বাড়ির ভিতর বন্দী হয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল বৌ। মুক্ত বায়ুতে একটু বেড়িয়ে এলো। স্বাধীনতার আনন্দ পেলো।"

কেন আমি কি আধুনিক নই, আমি কি স্বাধীন নই? দেয়ালে ঘেরা ছোট্ট বাড়ির ভিতর আমি তো হাঁপিয়ে উঠি না? এই দেয়ালই তো বাইরের অপরিচিত চোখ থেকে রক্ষা করে আব্রু! শত আধুনিক, শত স্বাধীন হলেও আব্রু নষ্ট করতে পারবো না।—মুখে কিছু বললাম না।

কাল রাতে বাগানে বসেছিলাম, আমি আর বৌ। এটা-ওটা দেখিয়ে সে নাম জিজ্ঞেস কচ্ছিলো! অদ্ভুত নাম উচ্চারণ শুনে হাসছিলাম। স্বামী আর দাদা বাগানের আর একপাশে গল্প করছিলেন।

রাত গভীর হয়ে এলো। গাছপালা ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেল। বৌ উসখুস করতে লাগলো, আমার সঙ্গ তার আর ভালো লাগছে না। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে দাদার কাছে গিয়ে কানে কানে কি বললো।

ওমা, খানিকক্ষণ পরে দেখি, দাদার হাতের ওপর গাল দু-খানা রেখে বসে আছে কচি খুকীর মত! দাদা নিশ্চয়ই

লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠেছে! ওদের হাসি-গল্প আর শোনা গেল না। শুধু পোকাদের অবিশ্রান্ত শব্দ।

উঠে চলে এলাম।

স্বামী দেখি বই পড়ছেন। ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, "বিদেশী মেয়েগুলো কি বেহায়া!"

হেসে বললেন, "তোমার কাছে বটে! কিন্তু এই তাদের রীতি।"

"সকলের সুমুখে আমি যদি আপনাকে অমন ধারা আদর করি, খুসি হবেন কি?"—ঝাঁঝিয়ে উঠলাম।

"তুমি অমন করলে বেহায়াপনা হবে বই কি!"—স্বামী বললেন।

রাগ করে কিযে মাথামুণ্ডু বললাম ঠিক নেই!

তারা ঠিক করেছে, বৌটি চীনে পোশাকে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করবে। দাদা তাকে আদব-কায়দা শিখিয়ে দিয়েছে। কী মুস্কিল, আমাকে আগে যেতে হবে উপহার নিয়ে!

রাতে ঘুমুতে পারি নি। কি করে যে মার কাছে মুখ দেখাব?

সাহস করে যে আজ মার কাছে গেলাম, সে তো আশ্চর্য! স্বামী আমাকে খুব সাহস দিয়েছিলেন, তবু বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল যেন বোন।

বিদেশী বৌটির মত যদি ভয় শূন্য হতাম!

বোন,

যে-মুহূর্তের আশঙ্কায় ক'দিন ঘুম হয় নি,—সে-মুহূর্ত এলো, চলেও গেল। সবটা বলছি, শোন ঃ

মার কাছে সকালে খবর পাঠিয়েছিলাম, আজ দেখা করতে যাব। লোক এসে বললো, বাবা দাদার আসার খবর পেয়ে টিয়েণ্টসিন চলে গেছেন। তিনি আমুদে লোক! চিরদিনই দেখেছি, কিছু একটা গোলমাল হ'লে তিনি বাড়ি থেকে সরে পড়েন। মা খবর পাঠালেন, দুপুরে দাদা আর আমি দেখা করতে পারি। বৌয়ের নামই করেন নি। দাদা কিন্তু বললে, "আমি যদি যাই, আমার স্ত্রীও যাবে।"

আমি আগেই রওনা হলাম। ভেট নিয়ে তিনটে চাকর চললো আমার সঙ্গে। দাদা বিদেশ থেকে নানারকম অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এসেছিল! ডালায় সেগুলি সাজিয়ে দিলাম। ঘড়ীর গহনাটার ওপর আমার এমন লোভ হচ্ছিল! ওমা, আর একটা কি অদ্ভুত যন্ত্র!—কথা কয়, গান গায়! আলোটাই বা কি চমৎকার—আগুন দিয়ে জ্বালাতে হয় না! উঠপাখীর পালকের পাখাটি কিন্তু ভারী সুন্দর! এক গোছা ডালিম ফুল যেন!

বাড়ি যেতেই মা আমাকে হলঘরে ডেকে পাঠালেন। ঢুকে দেখি সাটীনের জমকালো পোশাক পরে মা সুঙ্-সম্রাটের ছবির নীচে বসে আছেন। হাতে অনেকগুলি হীরে, চুনি, পান্না বসানো আঙ্টি ঝক্মক্ করছে। এমন সুন্দর আর সম্ভ্রান্ত কখনো দেখি নি!

অতো সাজলে কি হবে? শরীর আরো জীর্ণ হয়ে গেছে। চোখ রোগ-পাণ্ডুর, ঠোঁটে যেন মৃত্যুর ইঙ্গিত। আঙ্টিগুলো ঢিলে; হাত নাড়লে বেজে ওঠে। শরীর কেমন আছে, জিজ্ঞেস করবো ভাবলাম, কিন্তু সাহস হলো না।

ঝুড়ি থেকে একে একে সব জিনিস নামিয়ে তাঁর সুমুখে রাখলাম। মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে তিনি গ্রহণ করলেন। হুকুম দিলেন, জিনিসগুলো পাশের ঘরে নিয়ে যেতে। যাক্ জিনিস নিয়েছেন! এও শুভ লক্ষণ।

ধীরে ধীরে বললাম, "মা, দাদা বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছে।"

"আমি তা জানি।"—নীরস, উত্তাপহীন সে স্বর। দমে গেলাম। তবু সবই বলে ফেলা ভালো। বললাম, "বিদেশী মেয়েটিও সঙ্গে আছে।"

মুখের পানে তাকালাম, ভাবলেশহীন সে মুখ। "তারা কি আসতে পারে?"

"হাঁ, তোমার দাদা আসুক।"

দাদা আর বৌ দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। এসে

জানালাম, মা দাদাকে দেখা করতে বলেছেন। দাদার মুখে চোখে অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠলো। বৌকে কি বললো। বৌ মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়া মাত্র তার হাত ধরে মার ঘরে ঢুকে পড়লো। মা কি বলবেন? কিন্তু বাধা দেওয়ার সময় পেলাম কই!

আমাদের পিতৃপুরুষের হলঘরে বিদেশী এই প্রথম ঢুকলো। আমি পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাদার পেছনে সে যেন ভেসে গেল ঘরের ভিতরে। পরনে তার ভেলভেটের খাটো গাউন; হলদে চুল যেন আগুনের শিখার মত মুখের চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছিল! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিন্তু সহবৎ শেখে নি! বেহায়ার মত মার সামনে হাসছে! ড্যাবডেবে চোখ তুলে চেয়ে আছে! দাদাটা কি শিখিয়ে দেয় নি যে, গুরুজনের কাছে চোখ তুলে দাঁড়াতে নেই? নিজের পায়ে কুড়ুল মারলো দাদা! কিন্তু বউকে কি চমৎকার মানিয়েছে!

মা বিদেশিনীর পানে তাকালেন, চোখে চোখ মিললো; তাঁরা হলেন পরস্পরের শত্রু। মা চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

বিদেশিনী কি বললো? পরে শুনেছি; বলেছিল: "হাঁটু গেড়ে বসব নাকি?"

দাদা মাথা নাড়লো; দুজনে মার সামনে বসলো।

দাদা এবার কথা বললো—"মা বহুদিন পরে দূর দেশ থেকে তোমারই আদেশে তোমার কুপুত্র ফিরে এসেছে। এও আনন্দের কথা যে, তুমি আমাদের সামান্য উপহার গ্রহণ

করেছ। আমাদের বলছি এই জন্যে যে, আমার স্ত্রী আমার পাশে আছে। এর কথাই আমি চিঠিতে জানিয়ে ছিলাম। সে তোমারই ঘরের বধূ। একথা সে জানাতে চায়, বিদেশী রক্তে তার জন্ম হলেও স্বামীর বংশের অনুপযুক্ত সে হবে না। মনে প্রাণে সে চীনে; সে তার জাতির রীতি-নীতি ভুলে আমাদের সমাজকে অনুকরণ করছে। তার সন্তান হলে সে হবে এই দেব-প্রেরিত জাতির একজন। মা, মুখতুলে দেখ, তোমার প্রাপ্য সম্মান তার কাছ থেকে গ্রহণ কর।”

দাদা আর বৌ একসঙ্গে তিনবার প্রণাম করলো। তারপর মার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। মা কিছু বললেন না, বলতে পারলেন না। তাঁর শূন্য দৃষ্টি ওদের মুখের উপর পড়লো। চারদিক কি থম্‌থম্‌-ই না কচ্ছিল! আমার তো মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম! হঠাৎ মুখ থেকে ভাবলেশহীন গাম্ভীর্যের আবরণ খসে পড়লো; আনন্দে রক্তিম হয়ে উঠলো মুখখানি। মাতৃস্নেহের কাছে বংশগরিমাকে হারতে হলো তাহলে! কিন্তু কই? আবার তেমনি সাদা হয়ে গেছে।

“তুমি এসেছ বাবা, এ আমার কত আনন্দ! আচ্ছা যাও, পরে দেখা হবে।” মৃদুস্বরে বললেন।

দাদার সন্দেহ হলো। মাকে তাঁর এই উদাসীনতার জন্যে দুচার কথা শুনিয়ে দেবে, মনে হলো। ভাগ্যিস্, দরজার

আড়াল থেকে ইসারায় বারণ করেছিলাম! দাদা বউকে নিয়ে ফিরে এলো।

মার কাছে দৌড়ে গেলাম। মা কোনো কথা বললেন না। প্রণাম করে বেরিয়ে আসতে হলো। উঠোন থেকে দেখছিলাম, তুজন ঝির কাঁধে ভর দিয়ে ঘরের দিকে চলেছেন।

ভবিষ্যতে কি হবে, কে জানে!

দাদা আর বৌ সে-দিন অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলো। কথা কিছুই হলো না। বাড়ি সুদ্ধ যেন বোবা বনে গেছি!

বোন, কদিন বেশ কাটিয়ে এলে? তিরিশ দিন, না? কেমন কাটলো? হ্যাঁ, খোকন ভালোই আছে। কেমন মিঠে মিঠে বুলি শিখেছে! অষ্ট প্রহর আধো আধো কথা আর হাসি কান্নায় বাড়ি মাত করে রাখে। ঘুমুলে তবে বাড়িখানা জুড়োয়! ওর কথা শুনে হাসবারও যো নেই। রেগে দুম্‌দাম্‌ পা ছুঁড়তে থাকে। কি বীর পুরুষ! বাবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আবার হাঁটে।

ওঃ—তুমি দাদার বৌয়ের কথা বলছ? কি আর বলবো বোন, তারা এখনো মার আদেশের অপেক্ষায় আছে। দাদা তো অস্থির হয়ে উঠেছে, যাহোক একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে চায়। আমাদের দেশে কিন্তু সেটি হবার যো নেই। কত কথা মৃত্যু পর্য্যন্ত গোপন থেকে যায়, সময়ের আবার দাম কি? দাদা তো আর তা শুনবে না, ওকে পশ্চিমী অস্থিরতায় পেয়ে বসেছে যে!

মার সঙ্গে দেখা হবার পর এক, দুই করে অনেক দিন কেটে গেল, কোনো খবরই আর এলো না। দাদা তো প্রতি মূহূর্তেই খবরের আশা করতো। বউকে বড় বড় প্যাকিঙ্‌ বাক্স গুলো খুলতে দিল না। তখন যদি তার অবস্থা দেখতে।

দিন কাটতে লাগলো। খবর আসার নামগন্ধ নেই। কখনো বা বৌকে, কখনো বা মাকে মন্দ বলতো। আজকাল সাধারণতন্ত্রের দিনে প্রণাম করতে যাওয়া নাকি মূর্খতা! আমি তো শুনে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম; ওমা সাধারণতন্ত্র হয়েছে বলে মা পর হয়ে গেছেন!

বোঝাবে কে বল, যা রেগে আছে! বৌকে বরং ভালো বলতে হয়। সে বলে, প্রণাম করা যদি রীতি, কেন করব না? অবিশ্যি, অমনি করে প্রণাম করা কিন্তু ভালো লাগে না।

বৌটি বেশ শান্ত! দাদার মত হৈ-চৈ করে না। একদিন দেখলাম, দাদা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে কি বলছে ওকে। যুক্তি তর্ক মানছে না। বৌ দাদার মুখ খানা হাতে নিয়ে চোখে চোখ রেখে হাসলো। ওমা, দাদার যত রাগ জল হয়ে গেল!

সব সময় আর কি দাদাকে শান্ত করতে পারতো? এক একদিন রেগে বই খুলে পড়তে বসতো। কখনও খোকার সঙ্গে খেলা করতো। কি যে সব বলতো খোকাকে, বুঝতামও না!

আমার কাছে বীণা শিখেছে। এখন তো ভালই বাজাতে পারে। ওর গান কিন্তু আমাদের মত মিষ্টি নয়, উগ্রতা আছে। দাদাকে শান্ত করতে হলে ও আজকাল গান গায়।

বৌ মার কাছ থেকে খবর আসার আশা ছেড়েই দিল। দেখতাম, দাদার সঙ্গে, কখনো বা একা বেড়াতে যেত। একা গেলে ফিরে এসে কি দেখলো সেই গল্প করতো। একদিন ফিরে এলো খুব খুসি হয়ে। দাদাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম;

বাজারে নানা রঙের ঝুড়িতে নানারকমের শস্য দেখে এসেছে। এতেই অত খুসি! শহরের দোকানে নানারঙের ঝুড়ি আমরাও দেখেছি, অত খুসি হবার কিছু তো খুঁজে পাই নি! পশ্চিমী মেয়েরা ঐ একরকম।

তাই বলে বৌকে ভালোবাসি না, এমন মিথ্যে কথা বলতে পারবো না। কখনো কখনো ওকে দেখে সুন্দরী বলেও মনে হয়। স্বামীর কাছে নম্র হতেই শুধু জানে না। দাদা কিন্তু চটে না। চীনে-বৌ হলে কি হত?

দাদা বৌ-বৌ করে পাগল। বৌ যখন বই পড়ে, বা আমার খোকনকে আদর করে, দাদা অসভ্যের মতো তাকিয়ে থাকে। বৌ যেন দেখেও দেখে না। দাদার আর তর সয় না! গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ায়। ওদের ভালোবাসা এত গভীর!

প্রায় বাইশ দিন পরে মার কাছ থেকে খবর এলো, তিনি দাদাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। চিঠিখানা এত সুন্দর করে লিখেছিলেন মনে হলো, এবারে ওদের দুঃখ ঘুচলো। বৌ আর আমি তো উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

ঘণ্টা খানেক পরে দাদা ফিরে এসে আমাদের ঘরে ঢুকে বললো ঃ "না, বাপ-মার সঙ্গে থাকা আর ভাগ্যে হলো না।"

অনেক জিজ্ঞেস করতে ঘটনাটা খুলে বললো।

সে ঘরে ঢুকতেই মা আদর করে বসালেন, কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার মেয়াদ তো ফুরিয়ে এসেছে।"

দাদা শিউরে উঠে বললো, "সেকি মা! ওকথা বলো না। তোমার যাওয়ার এখনও সময় হয় নি। এখনও নাতির মুখ দেখ নি।"

"নাতি", মা বিড়বিড় করে বললেন, "নাতি! তুমি যদি না দেখাও, কি করে দেখব বল? লীর মেয়ে আমার ঘরের বৌ, এখনো কুমারী।"

তারপর কথা না বাড়িয়ে তিনি লীর মেয়েকে বিয়ে করতে অনুরোধ করলেন। দাদা জানালো, সে বিবাহিত। মা বললেন, বিদেশী পেত্নীকে বউ বলে ঘরে নেবেন না।

দাদা এইটুকুই বললো। ওয়াঙ-ডা-মা বলে, সে আড়াল থেকে সবই শুনেছিল। মা যখন দাদাকে ত্যাজ্যপুত্র করবার ভয় দেখালেন, দাদা বলেছিল, "তুমি আজ তোমার ছেলেকে ত্যাগ করছো, কিন্তু বংশরক্ষার জন্য সন্তান প্রসব করবার বয়স তোমার আছে? তবে, উপপত্নীদের কারো ছেলেকে পুষ্যি নিয়ে বংশরক্ষা করতে পার।"

পাগল নাকি! ছিঃ মাকে এমন কথা বলে!

তারপর দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওয়াঙ-ডা-মা নাকি মার কান্না শুনতে পেয়েছিলো। ঘরে ঢুকে কিন্তু দেখতে পেল, মা দাঁতে ঠোঁট চেপে বসে আছেন। সেদিনও দাসীর কাঁধে ভর দিয়ে তাঁকে হলঘর থেকে বেরুতে হয়েছিল।

দাদার অন্যায় নয়, মার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা? হাজার

অন্যায় করলেও তো তিনি মা। বৌটার ওপর এমন রাগ হয়, দাদাকে যেন হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে !

মাকে দেখবার জন্য কদিন থেকে মন কেমন করছিলো। স্বামী বারণ করলেন, দাদার আবার ডাক না পড়লে আমার যাওয়া হতে পারে না। দাদা যে আমাদের অতিথি !

কাল শ্রীমতী লিউ-ই বহুদিন পরে এসেছিলেন। বাবাঃ বাড়ির গুমোট কেটে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া দিল যেন দাদা আর বৌ তো আজকাল চুপ করেই থাকে। আমাকেও বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতে হয়। স্বামী যখন দুপুরে খেতে আসেন, দাদা আর বৌয়ের সঙ্গে দু-একটা কথা বলেন। শ্রীমতী লিউ-ই বেড়াতে এলেন না বাঁচলাম ! দু-দণ্ড কথা কয়ে সুখ পাওয়া যাবে। একদিন না, ওঁকেই দেখতে পারি নি ?

বৌ শ্রীমতী লিউ-ইর দিকে একবার তাকিয়ে আবার বই পড়তে সুরু করলো। আমাদের বাড়ীতে দাদা আসার পর আর কেউ বেড়াতে আসে নি। শ্রীমতী লিউ-ইর সঙ্গে বৌয়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই ওরা খুব হাসি-গল্প সুরু করলো। লিউ-ইকে আমাদের বিপদের কথা

বললাম, উনি গ্রাহ্যই করলেন না। বিদায় নেবার সময় বললেন, "সামান্য বিপদে কাতর হতে নেই। ও তো সবার জীবনেই আসে।" তারপর বৌয়ের পানে তাকিয়ে কি বললেন। বৌ চোখের জল সামলাতে পারলো না।

বললাম, "মা তো বিদেশী মেয়েকে বৌ বলে ঘরে তুলবেন না—এই নিয়েই গোল। মার যে কি হবে? রোগে রোগে শরীরে তো কিছু নেই, তার ওপরে আবার এই গোলমাল!"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীমতী লিউ-ই বললেন: "আজকাল হামেশাই এই হচ্ছে। বৃদ্ধ আর যুবকের মিল হতে পারে না। যুগ ধর্মে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।"

"এ বিরোধ খারাপ নয় কি?"—জিজ্ঞাসা করলাম।

"খারাপ নয়", তাঁর স্বর শোনা গেল, "এ তো অবশ্যম্ভাবী ফল। পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে আছে বলেই পৃথিবীর এই দুঃখ।"

মার দুঃখ ভুলতে পারলাম না বোন! শ্রীমতী লিউ-ই হয়তো ঠিকই বলেছেন: বুড়োবুড়ীদের দুঃখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

মাঝে মাঝে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কথা মনে হয়। আহা, তাঁরাও তো দুঃখ পাচ্ছেন! খোকনকে দেখিয়ে নিয়ে আসবো।

খোকনকে সাটীনের পোশাক, কালো মখমলের টুপি পরিয়ে দিলাম। গালে একটু সিঁদুরও দিলাম। এমন সুন্দরই দেখতে হলো আমার খোকনকে! ভয় পেলাম, পাছে সয়তানরা আমার যাদুকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়! শ্বশুরবাড়ী গেলাম।

ওঁর ঠাকুমা ওকে কোলে নিয়ে কত আদর করলেন। মনে ধিক্কার হলো, ছিঃ এমন করে আমার সোনামণিকে কিনা এঁদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু শ্রীমতী লিউ-ই বলেছেন: এই জগতের নিয়ম, বুড়োদের সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর মেলে না।

শ্বাশুড়ী অনেকক্ষণ ধরে খোকার মুখের পানে তাকিয়ে ছিলেন, হঠাৎ বললেন, "করেছ কি বৌমা, আমার নাতিকে সয়তানের হাত থেকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থাই কর নি! ওরে কে আছিস, শীগ্‌গির সোনার দুল আর ছুঁচ নিয়ে আয়।"

এ কথা কি আর আমি ভাবি নি। ছেলের কানে দুল পরিয়ে মেয়ে বলে সয়তানকে ফাঁকি দিতে হয়—এ কথা মা আমাকে বহুবার বলেছেন। কিন্তু বোন, খোকার নরম কানে ছুঁচ কি করে বেঁধাই বল?

শ্বাশুড়ী ছুঁচ নিয়ে কানে বেঁধাতেই খোকন ককিয়ে কেঁদে উঠলো। শ্বাশুড়ীর হাত থেকে ছুঁচ পড়ে গেল। ওকে শান্ত করে একটা সিল্কের সূতোয় গেঁথে দুলটা

খোকনের কানে ঝুলিয়ে দিলেন। এইবার খোকনের হাসি দেখে কে!

শ্বাশুড়ী খোকনকে এত ভালোবাসেন, আর মার আমার দুঃখ হবে না কেন? দাদা তো লীর মেয়েকে বিয়ে করে এমনি একটি নাতি এনে তাঁর কোলে দিতে পারতো! মার অদৃষ্টই মন্দ!

বোন, দেবতারা বুঝি আমাদের ওপর সদয় হয়েছেন। সকালে দাদা মার চিঠি পেয়েছে। মা লিখেছেন, দাদা ও তার বৌ বাড়িতে আসতে পারে। তবে তার বৌকে সদরে থাকতে হবে। বাবা ও আর আব জ্ঞাতি-গোষ্ঠিরা যা ভালো বিবেচনা করেন, তাই হবে। তিনি মেয়েমানুষ, সমাজের কি জানেন?

মার চিঠি পড়ে আমরা সবাই বিস্মিত হলাম। এমন দ্রুত পরিবর্তন কী করে সম্ভব হলো! দাদা হেসে বললো, "এ হবেই আমি জানতাম। মা তাঁর ছেলের উপর রাগ করে কদিন থাকতে পারেন?"

বললাম, "কিন্তু বৌকে মা কি ভালো চোখে দেখতে পারবেন?"

"দেখিস ওকে সবাই ভালোবাসবে।"—দাদা বললো।

কিছু বললাম না ; কিন্তু মনে তো জানি, চীনে মেয়েরা তাড়াতাড়ি কাউকে ভালবাসতে পারে না। আর বাগদত্তা বৌয়ের কথা মনে করে ওকে ভালোবাসা মার পক্ষে সম্ভব হবে কি ?

যে চাকরটা চিঠি নিয়ে এসেছিল, তাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ?

সে বললো, কাল রাতে মা প্রায় মরমর হয়েছিলেন। পুরুত এসে সারারাত শান্তি-স্বস্তয়ন করেছেন, এখন একটু ভালো আছেন। সকালে উঠে নিজের হাতে এই চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন।

মার এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারলাম। রোগের যন্ত্রণায় দেবতার কাছে শপথ করেছিলেন বোধ হয় যে, ভালো হলেই ছেলেকে ডেকে পাঠাবেন, তার দুর্ব্যবহার ভুলে যাবেন।—তাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

স্বামীর কাছে বায়না ধরলাম, মাকে একবার দেখে আসবো।

স্বামী অপেক্ষা করতে বললেন। কি জানি, যদি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েন বাঁচানো শক্ত হবে।

বৌয়ের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলাম। ওর ভাষা যদি জানা থাকত তাহলে বলতাম, তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁর একমাত্র অবলম্বনকে তুমি কেড়ে নিয়েছ, মনে রেখো। ভবিষ্যতে তাঁর দুঃখের কারণ আর হয়ো না।

বলতে পারলাম না। ইংরেজি না জেনে কি পড়েছি!

বোন, আজ দাদা আর বৌ চলে গেছে। ওরা সদরেই থাকবে, মা বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। অন্দরে ঢুকতে পারবে না বৌ। এখনো ছেলের বৌ বলে মা মেনে নিতে পারেন নি।

আমাদের বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। ওরা যেন খানিকটা আনন্দ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পশ্চিমী হাওয়া যেন ওরা, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে নিস্তব্ধ করে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

ওদের কথা ভাবছি। পুরানো বাড়ির সঙ্গে মিল হবে তো? স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওরা কি আমাদের পুরানো বংশের প্রথা মেনে চলবে?"

উনি উত্তর দিলেন, "বৃদ্ধ আর যুবার মিল হওয়া বড় শক্ত।" —এ যেন শ্রীমতী লিউ-ইর কথারই প্রতিধ্বনি!

স্বামী আরো বললেন, "একজন যুবতী আর একজন বৃদ্ধা যখন একই পুরুষকে ভালোবাসে, তখন কিযে হয় এক ভগবানই জানেন!"

খোকন মেঝেয় খেলা কচ্ছিল, তিনি কোলে তুলে নিলেন।

হঠাৎ তাঁর গম্ভীর স্বর শুনে আঁতকে উঠলাম। তিনি বললেন, "কিউ-ই-লান, ভেবেছিলাম কুসংস্কার তুমি বিসর্জন দিয়েছ।"

"আপনার মা পরিয়ে দিলেন।"—অনেক কষ্টে জড়িত স্বরে বললাম। "খোকাকে আমরা", তিনি বললেন, "এই অন্ধ কুসংস্কারের আওতায় মানুষ হতে দেব না।"

পকেট থেকে ছুরি বার করে সূতোটা কেটে ফেললেন। তারপর দুলটা জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "খোকা, তুমি আমার মত হবে। দেখ, আমি তো দুল পরি না। আমরা মানুষ, দেবতাকে ভয় করবো কেন?"

খোকা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

ভয় ভাবনা আমাকে ছেয়ে ফেলছে বোন! বুড়োরা কি এতই বোকা? না, না দেবতা আছেন বই কি! খোকনের মঙ্গলের জন্য আমি মানৎ করবোই, পূজো দেবই। নারীর কাছে সন্তান যে কি জিনিস, পুরুষ কি বুঝবে?

কুড়িদিন মার সঙ্গে দেখা হয় নি। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। দাদা আর বৌ বাড়ি গিয়ে কেমন আছে, সে খবরও জানি না। রাতে শুয়ে-শুয়ে ভাবি, মা কি বিদেশী বৌয়ের মুখ দেখেন ? উপপত্নীরা, ঝি-চাকররা বৌকে নিশ্চয়ই অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সন্ধ্যেবেলা কাজের পাট চুকিয়ে ওরা বোধ হয় বৌয়ের চালচলন, চেহারা এইসব নিয়েই গল্প করে। ওরা কেমন আছে, জানতে ইচ্ছে হয়। মাকেও অনেকদিন দেখি নি। মা একবার ডেকেও পাঠালেন না। কি জানি, রাগই করেছেন বোধ হয় !

দাদা একদিন দেখা করতে এলো। আমি তখন বসে বসে খোকনের জুতোয় জরীর কাজ কচ্ছিলাম। বসন্ত উৎসবের আর দেরী নেই। এমন সময়ে দাদা ঘরে ঢুকলো। চীনে পোশাক পরে দাদাকে ঠিক ছেলেবেলার মত সুন্দর লাগছিল ! একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। মুখখানা তো খুব গম্ভীর। বললে, “কিউ-ই-লান, মার বড় অসুখ। আজই দেখতে চল।”

সেইদিনই বিকেলে মাকে দেখতে গেলাম। উঠোন পেরিয়ে মার ঘরের দিকে যাচ্ছি, দেখি, দ্বিতীয়া করবী গাছের

তলা থেকে আমাকে ডাকছে। 'আসছি' বলে তাড়াতাড়ি মার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। প্রণাম করে মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম, স্বাস্থ্য ফিরেছে যেন! শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করলে পাছে চটে যান, তাই বললাম, "দাদাকে কেমন লাগছে মা?"

"তার সঙ্গে", মা বললেন, "দেখাই তো হয় না একরকম। তোমার বাবা ফিরে এলে লীর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের দিন ঠিক হবে। দিশী পোশাক পরছে, দিশী খানা খাচ্ছে; মতিগতি ফিরলো নাকি?"

বিয়ের কথা উঠতে সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন করলাম, "বিদেশী মেয়েটিকে কেমন লাগলো আপনার?"

"কেমন লাগবে আবার?" মুখ বিকৃত করলেন, "বিদেশীকে যেমন লেগে থাকে। সদরেই আছে; তোমার দাদার পেড়াপীড়িতে সেদিন চা করতে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কি গোদা-গোদা হাত, কি চেহারা! ওর এখনো অনেক শিখতে হবে। চুলোয় যাক গে। ছেলেকে ফিরে পেয়েছি, এই যথেষ্ট!"

কই দাদা তো একথা বলে নি? হয়তো, মাকে বৌ সন্তুষ্ট করতে পারে নি বলেই বলে নি। বেচারী বৌ! মাকে বললাম, "আমি যদি আমার বাড়িতে বউকে নিমন্ত্রণ করি, আপত্তি নেই তো মা?"

"না", তিনি উত্তর দিলেন, "যতদিন এখানে আছে' বাইরে

যেতে দেব না। মেয়েদের জীবনযাত্রা দেখে শিখুক, আর ও তো রীতি-নীতি কিছুই জানে না। লোকে ওকে দেখে হাসবে, আমি চাই না।"

আর বিশেষ কোনো কথা হলো না। মার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ছোটো গেট দিয়ে বেরুতেই দাদার সঙ্গে দেখা। সে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলো। জিজ্ঞাসা করলাম, "বৌ কেমন আছে?" মৃদু স্বরে বললে, "না ভালো নেই। আমরা চলে যাব।—"

ওর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, বিদেশ থেকে যে-দীপ্তি নিয়ে এসেছিল, সে-দীপ্তি নিবে গেছে!

সান্ত্বনার স্বরে বললাম, "একটা বছর তো দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।" দাদা উত্তেজিত হয়ে বললে, "এক বছর? একদিনও আর সহ্য করতে পারছি না। আমার স্ত্রীও ভেঙে পড়েছে। আমাদের খাবার তার মুখে রোচে না, বিদেশী খাদ্য আনবারও উপায় নেই। তার ওপর এই অবরোধ। সে মুক্ত আলো-হাওয়ার দেশের মেয়ে, সইতে পারবে কেন? রূপোর ফুলদানিতে জল না পেয়ে ফুল যেমন শুকিয়ে যায়, সেও তেমনি শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে, তার কত প্রেমিকের ভিতর থেকে সে আমাকে বেছে নিয়েছিলো। কিন্তু কি হাল তার আমি আজ করেছি!"

পোড়া কপাল, অনেক প্রেমিক ছিল, সে কথা আবার বলছে! ছিঃ বেশ্যারও অধম যে! এমন মেয়ে আমাদের সমান হবে!

নতুন ফন্দী মাথায় এলো। প্রশ্ন করলাম: "ও কি দেশে ফ়িরে যেতে চায়?"

এই তো এক উপায়! বৌ দেশে ফিরে গেলে, দাদা পুরুষ মানুষ, কদিন আর ভুলতে লাগবে? তারপর লীর মেয়েকে বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করুক।

কিন্তু দাদার সে চোখের দৃষ্টি ভুলতে পারব না! এই কথা বলা মাত্র জ্বলে উঠলো: "সে যদি চলে যায়, আমিও তার সঙ্গে চলে যাব। আর অনাদরে যদি এখানে তার মৃত্যু হয়, বাবা-মাকে ক্ষমা করবো না, তাঁদের সন্তান বলে পরিচয় দেব না।"

কি যে বলবো ভেবে পেলাম না! দাদা ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে চলে গেল। পেছু পেছু গেলাম।

দেখলাম, বৌ উঠোনে পায়চারী করছে। আবার বিদেশী পোশাক পরেছে—তেমনি ঘন নীল গলাখোলা গাউন; হাতে বিদেশী বই। আমাকে দেখেই হাসলো। কিছুক্ষণ বসেছিলাম; খোকনকে রেখে এসেছি, তাড়াতাড়ি উঠতে হলো। চলে আসবার সময় বৌ বললো, খোকনকে দেবে বলে কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরী করছে। খোকনকে একদিন নিয়ে আসতেও বললো। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে

ফেল্‌লো। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আবার শীগ্‌গিরই আসবো। একটু ম্লান হাসলো। আহা বনের পাখীকে খাঁচায় পুরে রেখেছে গো!

বছর কাটতে চলেছে বোন! বাবা দেশে ফিরে এসেছেন। দাদার বৌকে নাকি খুব ভালোবাসেন! ওয়াঙ-ডা-মার কাছে শুনেছি, বাড়ি ফিরে এসেই প্রথমে তিনি দাদার বৌয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারপর কাপড়-চোপড় ছেড়েই তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

দাদার ঘরে ঢুকেই বললেন, "কই তোমার বিদেশী স্ত্রী কোথায়?" বৌকে ভালো করে দেখে বললেন, "বাঃ বেশ দেখতে তো, চীনে কথা বলতে পারে তো?"

দাদা অসন্তুষ্ট হয়েই ছিল, বললো, "সবে শিখেছে।"

তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন, "তা প্রেমের কথা ইংরেজিতে মন্দ শোনাবে না, কি বল?"

বৌ বুঝতে পারে নি, খুব খুসি হলো। আহা বেচারী! এসে অবধি একটা মিষ্টি কথা শোনে নি! দাদা বুঝিয়ে দিলে, খুসি হবার কোনো কারণ নেই। বাবা বৌকে অপমান করেছেন!

ওয়াঙ-ডা-মা বলে, বাবা নাকি বৌয়ের দিকে হাঁ করে

তাকিয়ে থাকেন; ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। দাদা কিন্তু বৌকে কখনো বাবার কাছে একা ফেলে যায় না। বৌ যা ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝে না।

কাল বৌকে দেখতে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছ বৌ?"

হেসে বললো, "আগের চেয়ে ভালো। ওর মা সেই যে চা করতে ডেকেছিলেন, তারপর আর তাঁকে দেখি নি। ওর বাবা রোজই আসেন। বেশ লোক!"

"এমন একদিন আসবে", বললাম, "যখন মাও তোমাকে ভালোবাসবেন।"

ওর স্বর রুক্ষ হয়ে উঠলো: "কেন এখন তিনি ভালোবাসতে পারেন না? আমার অপরাধ, ভালো-বেসে তাঁর ছেলেকে বিয়ে করেছি, এই তো? না, এ বাড়িতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। ওর বাবাই আমাকে একমাত্র ভালোবাসেন। দেখ, দেখ, সব নির্বোধের মত তাকিয়ে আছে! সঙ্ দেখছে যেন! ওদের জ্বালায় আমি পাগল হব।"

দেখলাম, উপপত্নীরা আর ঝিগুলো ভিড় করছে। দরজা বন্ধ করে দিলাম।

"ওরা কি দিনরাত আমার কথাই আলোচনা করবে ?"—ঝাঁঝালো স্বরে বললো।

"ওরা তো বোকা। ছিঃ, ওদের কথায় রাগ করতে নেই!"—বললাম।

"না, আমি একদণ্ড ওদের সহ্য করতে পারি না।"—বৌ বললো।

ঘরখানা বিদেশী কেতায় সাজিয়েছে, দেখলাম। দেয়ালের চারদিকে বড়বড় ছবি আর ফোটোগ্রাফ টাঙানো। এক ফোটোগ্রাফ দেখিয়ে বললোঃ "এই আমার বাবা, এই মা, এই বোন।"

"ভাই নেই বুঝি ?"—জিজ্ঞাসা করলাম।

"না, তোমাদের মত ছেলে ছেলে করে আমরা পাগল হয়ে উঠি না। মেয়েই বা কম কিসে ?"

বৌয়ের বাবাকে দেখলাম, সাদা দাড়িওলা বুড়ো, চোখ দুটিতে ওরই মতো ঝড়; নাকটা খাড়া; টাক মাথা।

বৌ বললো, "উনি যে কলেজে পড়ান, তোমার দাদা সেখানে পড়তেন। ওখানেই আমাদের প্রথম পরিচয়। বাবার ফোটো যেন এ আবহাওয়ায় মানায় না। ঐ যে মা। বাবাকেই কিন্তু বেশি ভালোবাসি।"

এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, এবার টেবিলের কাছে গিয়ে কতগুলি সাদা কাপড় নিয়ে সেলাই করতে লাগলো। সেলাই করতে কখনো তো দেখি নি। আঙুলে

কি একটা পরেছে; আর ছুঁচ ধরেছে দেখ না, যেন ছুরি!

ওর মার ছবিতে মন দিলাম। বেশ ঢল ঢল মুখ খানি; দয়া মায়া চোখে যেন ফুটে উঠেছে! চুল অমন বিশ্রী করে ছাঁটা কেন? ওর বোনেরও।

বললাম, "মাকে দেখতে ইচ্ছে করে বৌ?"

"না", সংক্ষেপে উত্তর দিল। "চিঠিও লিখি না।"

"কেন?" অবাক হলাম।

"ভয় হয়। তিনি বড় বুদ্ধিমতী! চিঠিতে যতই লুকোই না কেন, আমার এই অবস্থা তিনি ধরে ফেলবেন। বাড়ির আর সবাই এই বিয়েতে খুব খুসি হয়েছিল। মা কিন্তু আশঙ্কা করেছিলেন।"

"কিসের আশঙ্কা?"—প্রশ্ন করলাম।

—"তিনি বুঝেছিলেন, বিদেশীকে বিয়ে করে শান্তি পাব না। আজ তো দেখতে পাচ্ছি, অশান্তির বেড়াজাল আমার চারদিকে তৈরী হচ্ছে। মার আশঙ্কা সত্যি হয়েছে। রাতে ভয়ে-ভাবনায় ঘুম আসে না। তোমাদের দেশের লোক-গুলোকে দেখে অজানা সন্দেহ মনে ঘনিয়ে আসে। সবাই যেন মুখোস পরে রয়েছে! তাদের বুঝতে পারা দেবতারও অসাধ্য! স্বামীও যেন এই দলেরই একজন। আমাদের দেশে থাকতে তো এরকম দেখি নি! একটা রহস্য যেন তাঁকে সাধারণের ওপরে সম্মান দিয়েছিল; আজ দেখছি তিনি

সাধারণ, অতি সাধারণ ! সহ্য হয় না বোন, সহ্য হয় না, তোমাদের মুখ নীচু করে থাকা, তোমাদের পদে পদে দাস মনোবৃত্তি। আমার দেশের সে উদারতা, সে উচ্ছলতা কোথায় ? একদিন স্বামীকে প্রেমে গদগদ হয়ে বলেছিলাম, প্রেমের জন্যে আমি চীনে বনে যেতে পারি। সে ভুল আজ ধরা পড়ে গেছে। আমি আমেরিকা, আমি আধুনিকতা, জীর্ণ সংস্কারের পূজো আমাকে দিয়ে হবে না।"

ওর অন্তর-নিরুদ্ধ জ্বালা যেন উপছে পড়লো। এত কথা যে বৌ বলতে পারে, ভাবি নি কোনদিন। অর্ধেক কথাই বুঝতে পারি নি, তবু বৌয়ের প্রতি করুণায় মন ভরে গেল।

দাদা এসে ঘরে ঢুকলো। আমাকে যেন দেখতেই পায় নি। বৌয়ের হাত দুখানি, গালে, চোখে মুখে চেপে ভাঙা স্বরে বললো, "মেরী মেরী, তুমি এমনি করে বলবে—আমি স্বপ্নেও ভাবি নি ! তুমি না একদিন বলেছিলে, আমার জাতি হবে তোমার জাতি ; তুমি হবে চীনের সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ ? এই এক বছরে যদি সে-পরিবর্তন সম্ভব না হয়, আমরা আবার আমেরিকায় ফিরে যাব। না হয়, কোনো অচেনা দেশে গিয়ে উঠবো। দুজনে দুজনকে নিবিড় করে পাব সেখানে। মেরী, আমার ভালোবাসায় তোমাকে সন্দিহান হতে দেব না।"

নিজের ভাষায় এমন সুন্দর করে দাদা বললো ! ইংরেজিতেও কি বললো ! মেরী দেখি, দাদার কাঁধের ওপর

মাথা রেখেছে! বেরিয়ে এলাম। ভালোবাসার নগ্ন প্রকাশ আমাদের সংস্কারের বাইরে। চোখে ভাল লাগে না।

বাইরে এসে দেখি, সবাই হাঁ করে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। বাবার উপপত্নীদের তো আর সামনা সামনি কিছু বলতে পারি না। তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে দাসীদের ধমক দিলাম। মোটা উপপত্নীটা কেক চিবুতে চিবুতে বললো, "সঙ্—বিদেশী পেত্নীটা একটা সঙ্!"

"আমাদের মত সেও মানুষ।"—উত্তর দিলাম।

শুনে হেসেই খুন!

বৌয়ের ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে-করতে বাড়ি ফিরলাম।

বোন,

যা আশা করি নি, তাই হলো। বৌয়ের গর্ভে সন্তান। ও আগেই টের পেয়েছিল, দাদাকে বলে নি। দাদা আজ বলে গেল।

এ সংবাদে আনন্দ হওয়া তো দূরের কথা, মা বিছানা নিয়েছেন, কদিন আর ওঠেন নি। তুমি তো জান বোন, বংশরক্ষার জন্য একটি ছেলে তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ছেলে যে বিদেশিনী তাঁকে উপহার দেবে, তা ছিল ধারণার অতীত! না পারবেন তিনি নাতিকে কোলে বসিয়ে আদর করতে, না হবে তাঁর বংশরক্ষা!

মার কাছে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই ফিরছি। দেখলাম, চোখ বুজে মড়ার মত পড়ে আছেন। আমাকে দেখে চোখ মেলে একবার তাকালেন। ভয় পেয়ে ওয়াঙ্-ডা-মাকে ডাকলাম। দেখি, ওয়াঙ্-ড়া-মা একটা আফিমের নল নিয়ে ছুটে এসেছে। মা নলটা টেনে স্বস্থ হলেন।

ও কপাল, আফিমের নেশা! আমি ভেবেছিলাম, মূর্ছা গেছেন! বৌয়ের সম্বন্ধে কথা বলতে যাব, উনি চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, "এখন বিরক্ত করো না!"

ওয়াঙ্-ডা-মা বললে, "এমনই রোজ হয়। আজকাল রোগে শোকে আরো বেড়ে চলেছে। মনে খুব লেগেছে! দেখলে না, শেকড়-কাটা গাছের মতো একেবারে লুটিয়ে পড়েছেন?"—সে নীল ঝাড়ন দিয়ে চোখ মুছে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

আমি জানি, তিনি কিসের আশায় আজো বেঁচে আছেন। বাড়ি গিয়ে স্বামীকে সব বলবো। একটি বার যদি মাকে দেখতে যান। অতো বড়ো ডাক্তার!

বাবা মেরীর ছেলে হবে শুনে খুব খুসি। বললেন, "আমাদের আর একটি খেলার সাথী বাড়লো। কি মজা!"

দাদা বাবার এই উচ্ছ্বাস বরদাস্ত করতে পারলো না। বাবাকে সে আজকাল ঘৃণা করে।

মেরী কিন্তু তার সমস্ত দুঃখ ভুলে গেছে। একদিন বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে গান গাইছে। গানের মানে জিজ্ঞাসা করতে বললে, এ হচ্ছে ছেলেদের ঘুম-পাড়ানী গান। ঘুম-পাড়ানীই বটে! শুনতে শুনতে আমারই চোখ জড়িয়ে আসছিল। মেরী আর দাদা আবার নতুন করে প্রেমে পড়েছে যেন। এখন কি আর মান-অভিমানের পালা গাইবার সময় আছে? সন্তান আসছে যে!

সন্তানটি কেমন হয় দেখতে হবে! না, আমার খোকনের মতো এমন সুন্দর হবেই না! মেয়েও হতে পারে। মেরীর মতো যদি হলদে চুল হয়? দাদা মেয়ে নিয়ে কি করবে? দাদা বড় অসুখী! চীনে আইনের চোখে মেরীকে স্ত্রী বলে প্রমাণ করতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। বাবা কিন্তু আমোলই দিচ্ছেন না। সামনের ভোজে দাদা নাকি জ্ঞাতিদের সুমুখে তার ছেলের উত্তরাধিকারিত্বের দাবী করবে। মেয়ে হলে অবিশ্যি কোনো কিছুই হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা তো আর বলা যায় না!

বছর এগারো মাসে পড়লো। বরফ পড়তে সুরু করেছে। বাঁশগাছ ঢেকে গেছে বরফে; বাতাসের দোলায় সমুদ্রের সাদা ঢেউ বলে মনে হয়। মেরীর গর্ভে সন্তান বাড়ছে, আর আমাদের বাড়ছে আশঙ্কা।

আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে তাকালাম। শীতের ধূসর আকাশ; শ্রীহীন গাছগুলো। হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা এ জীবনের মানে কি। আমরা তো দেবতার হাতের পুতুল। ভয় করেই বা কি করবো।

মন তো মানে না। দিন যতই এগিয়ে আসছে, ভয় ভতই বাড়ছে।

না। তাঁর রোগাতুর মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখে দাদা চমকে গেছে বোধহয়। সে ভেবেছিল, মা তার মুখ দেখতে চান না, তাই আর ডেকে পাঠান নি। অভিমান গলে গেল। ওয়াঙা-ডা-মার কাছে শুনেছি, ও রোজই এক পট চা দিয়ে আসে মাকে। মা কথা বলেন না। ওর বিদেশী বৌয়ের কথা কি মা ভুলতে পারেন?

দাদা বাবাকে চিঠি লিখেছিল। তিনি কাল আসছেন।

মা আজকাল কথা বলেন না। সারাক্ষণ ঘুমে যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। সেদিন চ্যাঙ্ এসে বললেন ঃ দেবতারা যদি মারেন, আমি আর কি করতে পারি?—এই বলে দর্শনী নিয়ে চলে গেলেন। স্বামীকে অনুরোধ করলাম। আজ কাল তো আর চোখে দেখতে পান না যে চিনবেন। উনি এসে একটিবার যদি দেখে যান। স্বামী দেখতে এলেন। মাকে তিনি এই প্রথম দেখলেন।

এত বিচলিত হতে তাঁকে কখনো দেখিনি। গম্ভীরস্বরে বললেন, আর উপায় নেই। তারপর আর একবার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, "ঠিক তোমারই মতো দেখতে। মনে হয়, তুমিই যেন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছ!"

কাঁদলাম; উনি রুমাল বার করে চোখ মুছিয়ে দিলেন।

আজকাল রোজই মন্দিরে যাই। খোকাকে কোলে পেয়ে দেবতাকে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই বুঝি মার অসুখ হলো! দেবতার দুয়ারে মদে মাংসে ষোড়শোপচারে পূজা দিলাম। দেবতা মুখ তুলে চাইবেন কি?

পাথরের দেবতা মুখ তুলে চাইলেন না। মা মারা গেছেন। তুমি খোকন আর আমার সাদা পোশাক দেখে বুঝতে পার নি?

রাতে মার কাছে ছিলাম। কি চেহারাই হয়ে গিয়েছিল। ব্রোঞ্জের পাতের মত বিছানায় লেগে ছিলেন; কথা বলা বা খাওয়ার শক্তি ছিল না। ভোর হওয়ার একটু আগে তাঁর অবস্থা আরো খারাপ হলো। দাদাকে ডেকে পাঠালাম। দাদা ঘরে ঢুকে দেখেই বললে, "শেষ হয়ে এসেছে। বাবাকে কেউ ডাকুক।"

ওয়াঙ্-ডা-মা মার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল, ওকেই বাবাকে খবর দিতে পাঠালাম।

মা হঠাৎ উঠে বসতে চেষ্টা করলেন। আমাদের দুজনের

দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন যেন! তারপর বিছানায় এলিয়ে পড়লেন।

বাবা আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় উঠে এলেন। কেঁদে বললেন, "উনিও আমাকে ছেড়ে চললেন!"

দাদা তাঁকে বাইরে নিয়ে গেলো। ওয়াঙ্-ডা-মাকে বলে গেল, বাইরে মদ নিয়ে যেতে।

আমি মার পাশে বসে রইলাম। মাকে যেই যা বলুক, আমি তাকে ভালো করে জানতাম। বাইরে রাগী হলেও ভিতরে তিনি ছিলেন খুব কোমল।

তাঁর দেহে নানা সুগন্ধ মাখিয়ে, সিল্কের জামা পরিয়ে দিলাম। কর্পূর কাঠের তৈরী কফিন এলো। মাকে কফিনে পুরে দিয়ে চোখের পাতার ওপর রাখলাম তাঁর প্রিয় হীরে চুণী, পান্না। দৈবজ্ঞ পাঁজি দেখে বললেন, নতুন বছরের ষষ্ঠী শুভদিন—ঐদিন তাঁকে কবর দেওয়া হবে।

পুরুতরা মিছিল করে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। ষষ্ঠী পর্যন্ত মার দেহ ঐখানেই রাখা হবে। দেবতাদের চোখের ওপর শত শতাব্দীর সঞ্চিত স্মৃতির ভিতর তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন। পৃথিবী তাঁর ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

বোন,

চার মাস কেটেছে। এই দেখ, শোকের সাদা সূতো এখনও কানে পরে আছি। মার জন্যে এখনও কাঁদি। আবার ভাবি, তিনি মরে জুড়িয়েছেন, নইলে আরো কত সইতে হত! তোমাকে বলছি সব।

মার দেহ নিয়ে চলে যেতেই বাবার উপপত্নীদের ভিতর, কে বাড়ীর কর্ত্রী হবে,—এই নিয়ে ঝগড়া বাধলো। সবাই কর্ত্রী হতে চায়, মার মত লাল সাটীনের পোশাক পরতে চায়! মরবার পর এমনি জাঁক করে সদরের বড় ফটক দিয়ে তার মৃত দেহ নিয়ে যাবে, কেনা চায় বলো? তা' জান না বুঝি? উপপত্নীরা মরলে তাদের খিড়কি দিয়ে নিয়ে যায়। তাদের আবার সম্মান কি? থাক্ ওকথা, উপপত্নীরা বাবার মন ভোলাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো।

লা-মে এখানে ছিলো না, প্রায় বছর ঘুরতে এলো সে গেছে, আর ফেরে নি। বাবা আর একটি উপপত্নী গ্রহণ করবেন শুনে, সে নিজের কোনো খোঁজ-খবর দেয় নি। মার মৃত্যু সংবাদ লিখতেই সে এলো। মন্দিরে মার কফিনের ওপর

আমাদের ঘরের মেয়েরা হ্যাঙলাপনা করবে কেন ? আজ আর তা মনে হয় না। স্বামী আমাকে ভালোবাসার শাস্ত্রে পণ্ডিত করে তুলেছেন। আমিও তো স্বামীর জন্য ব্যাকুল। কিন্তু উনি দু'দণ্ড ভালোকরে কথা বলবার সময় পান না, এমনি কপাল !

বৌ সুখী হয়েছে। পরিবারের কেউ নয় বলে তার দুঃখ নেই। সন্তান তার গর্ভে, সেই আনন্দেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এখন সে আমাকে বলে,

"আমার ছোট খোকা আমাকে শেখাবে। তার কাছে শিখবো, স্বামী আর তার বংশ গৌরব কি করে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। আর তো আমি নিঃসঙ্গ নই। আমার মত সুখী কে ?"

দাদা সাময়িক তৃপ্ত হয়, কিন্তু তার মনে দেশের রীতি নীতির বিরুদ্ধে, বাবার বিরুদ্ধে আগুন জ্বলছে। আমাকে মাঝে মাঝে বলে, "আমরা না হয় একরকম করে জীবন কাটিয়ে দেব, কিন্তু সন্তান ?. তাকে তার প্রাপ্য গৌরব থেকে বঞ্চিত করবার আমাদের অধিকার নেই।"

আমি মেয়ে মানুষ কি বলবো, বল ?

বৌ আসন্নপ্রসবা। দাদা বাবাকে গিয়ে বললো, "মা তো নেই, আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে এসেছি।"

বাবা মদ খাচ্ছিলেন। রূপোর পাত্র থেকে মদ ঢালতে ঢালতে বললেন, "বল"। দাদা বললো ; "আমার স্ত্রী আজ তার প্রাপ্য সম্মান দাবি করছেন। পশ্চিমের আইনে আমার বিবাহিত ; সে আমার স্ত্রী। সে চীনের সমাজের চোখেও আমরা স্ত্রীর সম্মান পেতে চায়। আমার সন্তান তার গর্ভে, তাই এখন সে সম্মানের বিশেষ প্রয়োজন।"

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেলন, "পশ্চিমের ফুলটি বড় সুন্দর! শুনে সুখী হলাম, সে তোমাকে একটি সন্তান উপহার দেবে। বসো, দাঁড়িয়ে কেন।"

টানা থেকে মদের বোতল বার করে দাদাকে একপাত্র ঢেলে দিলেন। দাদা খেল না।

মৃদু হেসে বললেন, "ও তুমি তো আবার খাও না! আচ্ছা, তাড়াতাড়ি কি? তোমার কথা ভেবে দেখব। তোমার মা চলে গেলেন সেদিন, কিছুতেই আর মন বসাতে পারছি না। ভাবছি, সাঙ্‌হাই গিয়ে কিছুদিন থাকবো। ভেবে-ভেবে কি শেষে অসুখ হবে? তোমার স্ত্রীকে আমার আশীর্বাদ জানিও। তার একটি পদ্মের মত খোকা হোক। আচ্ছা।" —তিনি হাসতে-হাসতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

দাদা তো ফিরে এসে বাবাকে যা নয় তাই বললো। আমরা না ধর্ম্মগ্রন্থে পড়েছি, বাপ-মার চাইতে স্ত্রীকে বেশি

ভালোবাসলে পাপ হয়? কিন্তু ভালোবাসা পাপ পুণ্য মানে না। এতো জ্ঞানী হয়েও শাস্ত্রকাররা একথা বুঝতে পারেন নি। দাদাকে দুষতে পারি না কিন্তু।

বৌও একথা শুনে চটে আগুন! মার অপমানেও এত চটে নি। বললো, "ভেবেছিলাম, উনি বুঝি আমাকে স্নেহ করেন। ভণ্ড, পশু কোথাকার!"

গুরুজনদের গালাগাল দেয়, এ কেমন বৌ গো! ভাবলাম, দাদা নিশ্চয়ই মন্দ বলবে। দাদাটা মাথা নীচু করে রইলো! বৌ দাদাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, "চলো, আমরা এমন সর্বনাশা জায়গা ছেড়ে চলে যাই।"

আমি তো অবাক বোন! দাদা বৌকে টেনে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

বাবা অবশেষে তাঁর মতামত জানালেন। এক জ্ঞাতি-ভাইকে দিয়ে সাঙ্‌হাই থেকে খবর পাঠিয়েছেন। তিনি কাল হলঘরে চায়ের টেবিলে দাদাকে বললেন ঃ

"তোমার বাবা তাঁর মতামত আমাকে বলে পাঠিয়েছেন, সমাজপতিরাও তাঁর সঙ্গে একমত। তিনি বলেছেন, বিদেশিনীকে তাঁর বংশের বধূ বলে গ্রহণ করতে পারেন না। তার শিরায় শিরায় অপবিত্র বিদেশী রক্ত বইছে। তার সন্তানকেও তিনি বংশধর বলে স্বীকার করতে পারেন না। তাঁর মতে মিশ্রিত রক্তে যার জন্ম, সে পৃথিবীর কলঙ্ক! তাঁর পূজায় পিতৃপুরুষরা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাঁরা চান, এমন সন্তানের পূজা, যার শিরায় শিরায় বিশুদ্ধ রক্ত বইছে।"

তিনি একটু থেমে একটি থলি বার করে বললেন, "তোমার বাবা অবিবেচক নন। তিনি একহাজার টাকা পাঠিয়েছেন, সন্তান প্রসবের পর বিদেশী পেত্নীকে একহাজার টাকা দিয়ে বিদায় করে দাও। সে চলে গেলে লীর মেয়েকে বিয়ে কোরো। লী এই আপদ বিদায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। শীঘ্রই বিয়ে করে সন্তানের পিতা হয়ে বংশ রক্ষা কর।"

—এই বলে থলিটা দাদার হাতে দিলেন। দাদা ছুঁড়ে

ফেলে দিল টাকার থলি! তার চোখদুটো দু-মুখো ছুরির ফলার মত চক্‌চক্‌ করে উঠলো। দাদা চিৎকার করে বললো, "নিয়ে যান টাকা। আমার বাবা নেই, আমার বংশমর্যাদা নেই। ইয়াঙের ছেলে বলে পরিচয় দিতে আমি লজ্জিত হচ্ছি! আমি আর এক মুহূর্ত আমার স্ত্রীকে নিয়ে এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় থাকবো না। আমরা এই পুরোনো সমাজকে ভেঙে সেখানে নতুনের সৃষ্টি করবো।"

দাদা বেরিয়ে গেল। জ্ঞাতিটি টাকার থলি নিয়ে সাঙ্‌হাইয়ে বাবার কাছে গেলেন।

আগে বলেছিলাম বোন, মা মরে বেঁচেছেন! মা এসব কথা শুনলে পাগল হয়ে যেতেন। আজ তাঁরই বংশে উত্তরাধিকারী হবে কিনা উপপত্নীর ছেলে!

দাদা একে বারে নিঃসম্বল হলো। তার অংশ থেকে লী-পরিবারের ক্ষতি পূরণ হবে। ওয়াঙ্‌-ডা-মা সেদিন বললে, লী-রা সম্বন্ধ দেখছে। দাদা শেষে ভালোবাসার জন্য সর্ব্বস্ব হারালো।

দাদা বৌকে জানায় নি, কি জানি যদি গর্ভের সন্তানের কিছু হয়। শুধু বৌকে বললো "চল আমরা এখানে থেকে চলে যাই। এই দেয়ালের ভিতর বন্দি থেকে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছে।"

বৌ আনন্দে সম্মতি জানালো। দাদা পিতৃপুরুষের ভিটে জন্মের মত ছেড়ে দিল। তাকে বিদায় দিতে কেউ এলো না। ওয়াঙ্-ডা-মা ওকে প্রণাম করে বিদায়ের সময় বললে, "আমার কর্ত্রীর ছেলে বাড়ী ছেড়ে চললো! তিনি ভাগ্য-বতী, স্বর্গে গেছেন। আমাকে রেখে গেলেন শেষে এই দেখতে? এই দেখবার আগে আমার মরণ হলো না কেন?" —বুড়ী অঝোরে কাঁদলো।

দাদা আর বৌ আমাদের মতোই ছোটো একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। দু-মুঠো ভাতের জন্যে দাদাকে গভর্ণমেন্ট স্কুলে পড়াতে যেতে হয়! বেচারি? আগে তো ভোরে উঠতেই পারতো না। একদিন বললাম, "বাপের ভিটে ছেড়ে পস্তাচ্ছ না তো?"

দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "না"।

দাদা মার মতই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

বোন,

কাল রাতে কি মজা হয়েছে শোনো! কাল অনেক রাতে দাদা দরজায় কড়া নাড়বার শব্দ শুনতে পেয়ে খুলে দিতে গেল; দেখে ওয়াঙ্-ডা-মা একটা মস্ত বাঁশের বাক্স আর একটা পুঁটলি নিয়ে হাজির। দাদাকে সে বললে, "আমি এখানে

থাকতে এসেছি। আমার মনিবের নাতিকে আমি ছাড়া কে পালন করবে ?”

দাদা বললে, “কিন্তু আমি তো ওঁদের বংশের নামে পরিচিত হতে চাই না। আমার মা-বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে।”

“কি,” ওয়াঙ্-ডা-মা চিৎকার করে বললে, “তুমি ওকথা বলছো! বাপের সঙ্গে সব চুকে যেতে পারে, কিন্তু মার সঙ্গে এখনও চোকে নি। বুড়ী ওয়াঙ্-ডা-মা, এখনো বেঁচে আছে, সে তোমাকে যেমনি করে পালন করেছিল, ঠিক তেমনি করে তোমার ছেলেকেও পালন করবে। ছেলের কাছে ঠাকুরমার গল্প করবে। তার বাপের বাড়ির গল্প করবে।”

দাদা কি উত্তর দেবে ? আমার মার বাপের বাড়ির ঝি—আমাদের দুধমা। দাদা চুপ করে গেল। ওয়াঙ-ডা মা দাদার বাড়ীতে জাঁকিয়ে বসেছে।

মার অগাধ ভালোবাসা ওকে তাঁর ছেলের কাছে টেনে এনেছে। দাদা আর বৌ ওকে পেয়ে খুব খুসি! দাদার ছেলে দাদারই মতো ওয়াঙ্-ডা-মার হাতে মানুষ হবে।

আজ সকালে ওয়াঙ্-ডা-মা আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল। বাপের বাড়ির খবর দিয়ে গেলো। প্রথমা উপপত্নীই এখন কর্ত্রী। পূর্বপুরুষের স্মৃতি-ফলকের সমুখে জ্ঞাতিরা তাকে বাবার স্ত্রী বলে স্বীকার করেছে। অহংকার মাটিতে নাকি পা পড়ে না! শুনলাম, লাল সাটীনের

পোশাক পরে, দশ আঙুলে দশটা আঙটি দিয়ে বাড়ীতে ঘোরে, আর হুকুম চালায়। মার ঘরখানাও নাকি দখল করেছে! এসব শুনে কি আর বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয়?

আজ দাদার ওখানে গিয়েছিলাম। ফিরতি মুখে তোমার এখানে। দাদা আর বৌ বেশ আছে! ওদের বসবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, বৌ চিঠি লিখছে। আমাকে আর খোকনকে দেখে উঠে এলো। বললে, "মার কাছে এতদিন পরে চিঠি লিখছিলাম, বোন। আর বাধা নেই। মা পড়ে খুব খুসি হবেন। ঘরখানা একবার ভালো করে দেখ, কিছু পরিবর্তন হয় নি? এই দেখ, জানলায় হলুদ সিল্কের পর্দা; ফুলদানিতে নার্সিসাস ফুল সাজিয়েছি; খোকার ঘুমোবার জন্যে একটা আপেলফুল রঙের সিল্ক দিয়ে বিছানা তৈরী করলাম। সবই আমার খোকার জন্যে।" খুসিতে ওর মুখ ঝলমল করে উঠলো। কথা যেন বৌয়ের ফুরোতেই চায় না!

মেঘে ভরা আকাশের নীচে ধূসর উপত্যকা দেখেছ বোন? হঠাৎ মেঘ সরে গেলো; সূর্য হাসলো—উপত্যকার বুকে সুরু হলো রঙের খেলা। বৌ যেন সেই উপত্যকা। ওর চোখ আনন্দে জীবন্ত; কথা তো নয়, যেন গান!

এতদিন ওর সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। আজ কিন্তু মনে হলো, ও সুন্দরী, ও অপূর্ব! চোখে আর ঝড়ের আভাস নেই—সমুদ্রের নীল জল যেন সূর্য কিরণে টল টল করেছে!

দাদারও অস্থিরতা চলে গেছে, এখন সে খাঁটি পুরুষ।

যখন ভাবি, এরা প্রেমের জন্য দেশকে ত্যাগ করেছে, সমাজকে ত্যাগ করেছে, মাথা এদের কাছে সম্ভ্রমে নুয়ে পড়ে। এদের সন্তান, সে হবে পৃথিবীর বিস্ময়!

ওদের সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায়। সে, কি পূবে, কি পশ্চিমে—কোথাও তো ঠাঁই পাবে না। তাকে নিজের জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। বাপ-মার মতো মনের জোর থাকলে সে তা পারবে। সে দু-জাতির মিলন ঘটাবে। মেয়ে মানুষ, এ সব বড় বড় কথা মাথায় ঢোকে না। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবো।

বৌ রাতদিন গান গায়, ওর হৃদয়ের আনন্দ সুরের পথ বেয়ে ঝরে পড়ে। আমি তো ছেলের মা, ওর আনন্দের খবর রাখি। ওর ছেলের জন্য দুজনে বসে চীনে পোশাক তৈরী করি। মাঝে মাঝে কাপড়ের রঙ পছন্দ নিয়ে বৌ গোলমালে পড়ে। বলে, "খোকার চোখ যদি কালো হয়, এই লাল পোশাকটা তাকে পরাবো, বোন! কিন্তু যদি ধূসর হয়, তা হলে তো বেগুনী পোশাকই মানাবে ভাল!" আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, বোন, খোকার চোখ দুটি কেমন হবে?"

হেসে উত্তর দিই, "তোমার কি মনে হয়?"

আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তেই লজ্জিত হয়ে বলে, "ওর বাপের মতো কালোই হবে। লাল কাপড়টাই নিই, কি বল?"

বলি, "ঐ তো আনন্দের রঙ্‌।"

পোশাক তৈরী করছি, কাপড়ের ওপর ফুল তুলছি আমরা দু-জনে। খোকার জুতোয় জরী দিয়ে বাঘ আঁকা হয়েছে। এখন তো আর ওকে পর ভাবি না। ও আমার বোন। নাম ধরে ডাকতেও শিখেছি। মেরী! মেরী!

চীনে পোশাকের পর বৌ বিদেশী পোশাক তৈরী করেছে। কি সাধাসিধে আর সুন্দর! জরী বসিয়ে জবরজঙ করে নি, লেস বসিয়েছে। কাপড়ও চমৎকার, কুয়াসার মতো হালকা আর সাদা!

শুধোলাম, "এ পোশাক খোকাকে কখন পর্যাবে?"

হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "সপ্তাহে ছ' দিন খোকা ওর বাবার, তখন ও চীনে পোশাক পরবে। সাতদিনের দিন আমি ওকে পুরোদস্তুর সাহেব সাজিয়ে দেব। তখনও আমার। প্রথম ভেবেছিলাম, পুরোপুরি চীনে করেই তাকে মানুষ করবো। এখন দেখছি, আমার দেশের সঙ্গেও তার যোগসূত্র দরকার। পৃথিবীর দু-দেশের রক্তে তার জন্ম, সে দু-দেশেরই ছেলে!"

হাসলাম। এমন না হলে কি বৌ দাদার মন পেতো!

বৌয়ের একটি খোকা হয়েছে। খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। ওয়াঙ্-ডা-মার কোল থেকে খোকাকে নিয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম! কি স্বাস্থ্য! পশ্চিম থেকে পেয়েছে স্বাস্থ্য,

আর পূব থেকে পেয়েছে কালো চোখ, রেশমের মতো কালো চুল ! সব থেকে অবাক হলাম, মুখে মার আদল দেখে ! বৌয়ের কাছে বলি নি, বোন ! খোকাকে নিয়ে গিয়ে বৌয়ের কাছে বসলাম। বললাম, "ছোট্ট এই গ্রন্থিটুকু দিয়ে পূব ও পশ্চিমকে তুমি বেঁধেছ।" বৌ হাসলো। ক্লান্তি আর আনন্দে ভরা সে হাসি ! বললে, "খোকাকে আমার বুকের ওপর দাও।"

খোকা মার দুধের মত সাদা বুকের ওপর শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করতে লাগলো।

হেসে বললাম, "ওকে তো লাল পোশাকই পরাতে হবে। বেশ কালো হয়েছে।"

"ওর বাবার মত।"—বৌ উত্তর দিল।

দাদা আসতেই আমি বিদায় নিলাম।

কাল রাতে খোকার ঘরে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বাইরে জ্যোৎস্নায় আলোয় আলো হয়ে গেছে ! বাতাস বইছিল আস্তে আস্তে। আমাদের পেছনে খোকা বাঁশের দোলনায় ঘুমুচ্ছিল। আজকাল বেশ বড় হয়েছে ! দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলাম। তারপর বললাম, "দাদার খোকা তো বিচ্ছেদের ব্যথা নিয়েই জন্মালো। একদিকে ওর মা, তার দেশ, তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, অন্যদিকে ওর বাবা,

আত্মীয়-স্বজন, এমন কি তার বাবাকেও ত্যাগ করলো, বংশের গৌরব ক্ষুণ্ণ করলো!"

স্বামী বললেন, "আজ আর ওকথা ভেব না, কিউ-ই-লান। শুধু চেয়ে দেখ, বিভিন্ন দুটি নর ও নারীর প্রেম তাকে পৃথিবীর আলো দেখালো। সে হলো তাদের যোগসূত্র। পূব আর পশ্চিমের যুগার্জিত সংস্কার নিয়ে ওর বাপ-মা দুজনেই জন্মেছিল; খোকা কিন্তু তাদের সংস্কার চূর্ণ করে দিয়েছে।"

তিনি এমনি করে আমাকে আগেও বলতেন। পুরোনো সংস্কারের নাগপাশ কেটে আমাকে তিনি উদার ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে চলেছেন।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "আমরাও চাই না, আমাদের খোকার মনে জাতিগত অন্ধ সংস্কার বদ্ধমূল হোক। তাকে আমরা জীবনের পথে উৎসাহ দেব সংস্কার চূর্ণ করতে, নতুনের স্বপ্ন দেখতে।"

ভেবে দেখলাম বোন, স্বামীর কথাই ঠিক।